ব্রতচারী-পরিচয়

গুরুসদয় দত্ত

ব্রতচারী পরিচয়

গুরুসদয় দত্ত

বাংলার ব্রতচারী সমিতি

প্রাপ্তিস্থান

ব্রতচারী কেন্দ্রভবন

১৯১।১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

(ফোন—৩৪-২৫৪৬)

দ্বিতীয় সংস্করণ

টা. 8.00

প্রকাশক :—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র
প্রধান সচিব
বাংলার ব্রতচারী সমিতি

মুদ্রাকর :—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ন দাস লেন
কলিকাতা-৬

মরমী ব্রতচারী বন্ধুবর

মনোজ বসুকে

ব্রতচারী-সংনির্ম্মাণ-সাধনায় অমূল্য সহযোগিতার

সকৃতজ্ঞ নিদর্শন-স্বরূপ

সাদর উৎসর্গ

প্রকাশকের নিবেদন

ব্রতচারী পরিচেষ্টার প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত প্রণীত "ব্রতচারী পরিচয়" ১৯৪১ সালের ৪ঠা মার্চ্চ প্রথম প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ৩২ বৎসর পরে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ পুর্ণমুদ্রিত হ'লো। শাশ্বত সমাজগঠনে ব্রতচারী কর্ম্মপদ্ধতি বিশ্বের সর্ব্বত্র কিভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছে তার উল্লেখ এই পুস্তকে আছে। ব্রতচারী পরিচেষ্টার উদ্দেশ্য, অন্তর্নিহিত ভাবরূপ ও সংজ্ঞা "ব্রতচারী পরিচয়ের" ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হয়েছে। যাঁরা ব্রতচারী পরিচেষ্টাকে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে চান্ তাঁদের এই পুস্তকটি বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে।

বর্ত্তমান সংস্করণে লেখকের দুটি প্রবন্ধের স্থলে 'বাংলার শক্তি" পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ও ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ পুনঃ প্রকাশিত হ'লো। এ ছাড়াও কয়েকটি প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ বর্ত্তমান সময়োপযোগী করে পরিবর্ত্তনসাধন করা হয়েছে। সংসদ সদস্য ডক্টর অমিতাভ ভট্টাচার্য্য ও অপর সচিব শ্রীশঙ্কর প্রসাদ দে কর্ত্তৃক উপরোক্ত সংযোজনা ও সম্পাদনা বাংলার ব্রতচারী সমিতির সংসদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছেন। ইতি

শিশির কুমার মিত্র
প্রধান সচিব
বাংলার ব্রতচারী সমিতি

১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৩

সূচীপত্র

নিবেদন

ব্রতচারী প্রচেষ্টা বিগত নয় বৎসরের মধ্যে কেবল বাংলায় নয়, ভারতের নানাস্থানে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই একটি সর্ব্বভারতীয় প্রচেষ্টা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার সত্য প্রকৃতি ও গভীর অন্তর্নিহিত অর্থ এবং মতবাদ সম্বন্ধে এখনো শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যথেষ্ট অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান। ব্রতচারী প্রচেষ্টাতে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রের মূল সাধনা প্রণালী অভিনিবিষ্ট আছে বলিয়াই যারা ইহার কেবল একটি দিক দেখেন, তারা সম্পূর্ণ ভূল বোঝেন।

ব্রতচারী সমিতির মুখপত্র "বাংলার শক্তি" পত্রিকায় আমি ধারাবাহিক ভাবে ব্রতচারী প্রণালীর অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তাহাতে এই অন্তর্নিহিত অর্থটিকে যতদূর সম্ভব সহজভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতকগুলি দুই বৎসর পূর্ব্বে "ব্রতচারীর মর্ম্মকথা" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। "ব্রতচারীর পরিচয়" নামক এই সংস্করণে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইল। যাঁরা ব্রতচারী প্রণালী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু অর্থাৎ ইহার সঙ্গে যুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁরা এই প্রবন্ধগুলি হইতে সাহায্য পাইবেন বলিয়া আশা করি।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোজ বসু এবং স্নেহাস্পদ শিল্পী শ্রীমান সুধাংশুকুমার রায় এই পুস্তকখানার মুদ্রণ কার্য্যে আমাকে নানারূপ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

গুরুসদয় দত্ত

৪ঠা মার্চ, ১৯৪১

ভূমিকা

ব্রতচারী অনুচেষ্টার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাংলা দেশে—১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৩শে মাঘ তারিখে বীরভূম জেলার কেন্দ্র-শহর সিউড়িতে। সেখানে তখন বাংলার জাতীয় নৃত্য ও জাতীয় গীতি শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় পল্লী সম্পদ-রক্ষা-সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রথম পরিশীলন শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই শিবিরের বিজ্ঞপ্তিতে তখন বাংলার জননৃত্য ও জনগীতির শিক্ষার কথারই উল্লেখ ছিল; "ব্রতচারী" নামের আবিষ্কার ও ব্যবহার তখনও হয়নি। সেই শিবিরের অনুষ্ঠান করিবার আগে আমি এইমাত্র উপলব্ধি করেছিলাম যে, বাংলার জাতীয় নৃত্য ও জাতীয় গীতির মধ্যে বাংলার ভূমি-আত্মার—তথা জাতি-আত্মার—স্ব-ছন্দ এবং সুগভীর ও সূক্ষ্মতম স্ব-ভাষা সন্নিবিষ্ট ও সংরক্ষিত হয়ে আসছে; এবং তার ভিতর দিয়ে বাঙ্গালী আবার তার স্ব-জাতি ও স্ব-ভূমির আত্মার সঙ্গে আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ বাংলার জাতীয় জীবনকে পুনর্জাগ্রত করতে হ'লে যে তাকে বাঙ্গালীর স্ব-ভূমির ও স্ব-জাতির স্ব-ছন্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এই চেতনা আমার সেই প্রথম শিবির অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই হয়ে ছিল।

সেই শিবিরের একমাসব্যাপী স্থায়িত্বের মধ্যভাগে আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয় যে, জীবনকে স্ব-ভূমির ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও তাকে একটা পবিত্র "ব্রত" রূপে গ্রহণ ক'রে কয়েকটি সুচিন্তিত সুসম্বদ্ধ ও সুগভীর আদর্শের সাধনার ভিতর দিয়ে কর্ম্ম-জীবনে প্রাকাশ করার একান্ত প্রয়োজন। এই উপলব্ধির ফলেই আমার মনে "ব্রতচারী" নামের স্বতঃ উদ্ভব হয় এবং ব্রতচারীর আদর্শমূলক তেরটি "পণ"-এর পরিকল্পনার জন্ম হয়। শিবিরে

সমবেত পরিশীলনপ্রার্থী শিক্ষকদের কাছে আমি এই পরিকল্পনার উল্লেখ ও বর্ণনা করি, এবং একদিকে বাংলার জাতীয় স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারাবাহী নৃত্য ও গীতের অনুশীলন এবং অপর দিকে আত্মার কর্ত্তব্যের ব্রতপালনের সাহায্যের জন্য ঐ তেরটি পণের অনুসাধনা-মূলক কর্ম্মপ্রবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে যারা জীবনের পরিচালনার ও পূর্ণ পরিণতি লাভের প্রয়াসী, তাদের "ব্রতচারী" আখ্যাদানের যে প্রস্তাব আমি উপস্থাপিত করি, তা শিবিরবাসী সকলেই অতি আগ্রহের সহিত অনুমোদন করেন। এই ঘটনাটি হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ঐ ২৩শে মাঘ তারিখে। আমার জীবনে সেদিন বাংলার জাতীয় আত্মার চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠার গভীর আকুতি ছন্দরূপ ও নাম পরিগ্রহ করে "ব্রতচারী" নামে প্রকাশ লাভ করেছিল।

তারপর এই নয় বৎসর কাল দিনের পর দিন বর্দ্ধিত-আত্মা ও বর্দ্ধিত-কলেবর হয়ে সেদিনকার ঐ ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি আজ বহু শাখা-প্রশাখাশালী বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হয়েছে এবং প্রতিবৎসরই ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিস্তৃতি লাভ করেছে, এবং সমগ্র ভারতব্যাপী এমন কি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

আজ বিশ্বের বিশিষ্ট মনীষিগণ স্বীকার করেছেন, ব্রতচারী কেবল বাংলার জন্য নয়—সমগ্র ভারতের জন্যে; এবং কেবল ভারতের জন্য নয়—সমগ্র বিশ্বের জন্যে তার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে রয়েছে। এই অনুচেষ্টার ভিতর দিয়ে দেহ মন ও আত্মার যুগপৎ সমগ্র বিকাশ সাধন ক'রে বাঙ্গালী অপ্রতিহত শক্তিমান্ কর্ম্মবীর হয়ে সমগ্র ভারতে এবং ক্রমে সমস্ত বিশ্বে তার সংস্কৃতি বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

যারা পল্লবগ্রাহী, তারাই এই অনুচেষ্টাকে একটা নাচ-গানের বা আমোদ-প্রমোদের অথবা কেবলমাত্র ছেলেমেয়েদের চিত্তবিনোদনের ও শরীর-চর্চ্চার ব্যাপার মনে করে' ভুল বোঝেন। যারা সমঝদার ও চিন্তাশীল, তারা এর মধ্যে গভীরতর উদ্দেশ্যের এবং শরীর, মন,

চরিত্রগঠনের ও জাতিগঠনের অতি সুচিন্তিত কার্য্যকরী ও শক্তিশালী সাধনা-প্রণালীর পরিচয় পান।

ব্যক্তিকে ও জাতিকে অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়কে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মস্থ ও শক্তিশালী করাই ব্রতচারী অনুচেষ্টার উদ্দেশ্য। ইহার লক্ষ্য মানুষের পূর্ণ আত্মপ্রকাশের আকুতির পূর্ণ রূপায়ন; কেবল চিন্তায় নয়, কেবল কথায় নয়, কেবল আচরণে নয়—একাধারে চিন্তায়, কথায় ও কর্ম্মে, অর্থাৎ একাধারে কায়মনোবাক্যে। ব্রতচারী পরিকল্পনা চায় প্রত্যেক দেশের মানুষকে দিতে—ভিতরে ও বাহিরে—পূর্ণ-স্বাধীনতা, পূর্ণ-শক্তি, পূর্ণ-সংহতি, পূর্ণ-শান্তি, পূর্ণ-প্রগতি, পূর্ণ-চেতনা ও পূর্ণ-আনন্দ।

বর্ত্তমান যুগে মানুষ কি অন্তর্জীবনকে কি বহির্জীবনকে পরস্পর সম্পূর্ণ বিযুক্ত পৃথক পৃথক কোঠায় ভাগ করেছে—আর সে সব পৃথক কোঠার নাম দিয়েছে শরীর, মন ও আত্মা; দর্শন, বিজ্ঞান, কলা ও ধর্ম্ম; কর্ম্ম ও আনন্দ; এবং এগুলির উৎকর্ষের জন্য সাধনা করেছে পৃথক পৃথক কোঠায়। তার ফলে আজকাল সব দেশেই বেশীর ভাগ মানুষের নিজের নিজের অন্তর্জীবনের ভিতরে সমন্বয়ের পরিবর্ত্তে সৃষ্টি হয়েছে গভীর অন্তর্বিরোধের। মানুষের আত্মা হারিয়েছে তার শরীর মন ও বাক্যের উপর—তার চিন্তা আচরণ ও ভাষার উপর—প্রভুত্ব। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে চলেছে এই অন্তর্বিরোধ ও অন্তঃসংগ্রাম। বাইরের যে সংগ্রাম ও বিপ্লব আজ সমগ্র বিশ্বসভ্যতাকে ধ্বংস করতে দাঁড়িয়েছে, এটা এই ব্যক্তি-জীবনের অন্তর্বিরোধের বাহ্যিক অভিক্রিয়া ও অভিপ্রকাশ মাত্র।

ব্রতচারী পরিচর্য্যায় আছে ব্যক্তির জীবনের এই অন্তর্বিরোধ নিরাকরণের অব্যর্থ প্রণালী—ছন্দের সাধনা দ্বারা শরীর মন ও বাক্যকে আত্মার আনুবশ্যে আনার অমোঘ পদ্ধতি।

প্রত্যেক ব্রতচারীকে তাই নিতে হয় পাঁচটি মূল ব্রত :—জ্ঞান-ব্রত, শ্রম-ব্রত, সত্য-ব্রত, ঐক্য-ব্রত, ও আনন্দ-ব্রত। অর্থাৎ

তাকে অনুক্ষণ চেষ্টা করতে হয় জীবনে যুগপৎ জ্ঞানাগ্রহ, শ্রমাগ্রহ, সত্যাগ্রহ, ঐক্যাগ্রহ ও আনন্দাগ্রহের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীর, মন ও বাক্যকে—চিন্তা, কর্ম্ম ও ভাষাকে—মানব-আত্মার শাশ্বত নির্ম্মল আদর্শের অনুগত ও অনুব্রত করে তুলতে। এই উদ্দেশ্যে তাকে নিতে হয় ষোলটি পণ, সতেরোটি মানা ও কয়েকটি প্রণীতি ও প্রণিয়ম। এতগুলির সংখ্যাতে ভয় পাবার প্রয়োজন কারো হয় না, কারণ ছন্দে এগুলি রচিত ও ছন্দে আবৃত্তি করতে হয়, তাই অতি সহজেই কি শিশু, কি প্রৌঢ় সকলেরই স্মৃতিতে অতি সহজে গ্রথিত হয়ে থাকে। ব্রতচারী সাধনা-পদ্ধতিতে আরো আছে কয়েকটি নৃত্য ও গীত। এগুলি কিন্তু বাজারের বা রঙ্গমঞ্চের নৃত্যগীতের জাতীয় নয়, উপাসনা জাতীয়—পরকে দেখিয়ে বাহবা বা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নয়; নিজের নিজের আত্মার আনন্দের ও অনুপ্রেরণার আবেগকে যুগপৎ কায়মনোবাক্যে পূর্ণ রূপায়িত করে' কর্ম্ম, চিন্তা ও ভাষাকে আত্মার অনুবশ করার ও তাদের পরস্পর বিরোধ নিরাকরণ করে' তাদের মধ্যে একত্ব স্থাপনের সাধনার এগুলি একটি অতি-প্রাচীন বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি।

জাতির বিশ্লিষ্ট শত সহস্র মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের গুপ্ত শক্তি নিহিত আছে ব্রতচারীর নৃত্যগীত-প্রণালীতে। বৈদিক উদাত্ত মন্ত্রে জাতীয় ও মানবীয় ঐক্য গঠনের যে মহাপ্রণালী বহুযুগ পূর্ব্বে মানবসভ্যতার আদিযুগে ভারতে ঘোষিত হয়েছিল :—

> "সংগচ্ছদ্ধং সংবদদ্ধং সং বো মনাংসি জানতাম্;
> সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
> সমানী ইব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানিব;
> সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।"

ব্রতচারী নৃত্যগীত এই ঐক্য-সৃষ্টি-প্রণালীরই ভারতের বর্ত্তমান যুগোপযোগী রূপায়ন।

পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের যুক্ত-উপাসনা পদ্ধতিতেও এই সমমন্ত্রতা সমচ্ছন্দতা সমকণ্ঠতা ও সমতানতা-প্রণালীর বিরাট ও অমোঘ ঐক্য-বিধায়িনী শক্তির সন্নিবেশ ও পরিচয় প্রকৃষ্ট ভাবে পাওয়া যায়।

এই অব্যর্থ সাধনা-শক্তি ব্রতচারী অনুচেষ্টার পদ্ধতিগুলিতে নিহিত আছে বলেই মহাত্মা গান্ধী এই অনুচেষ্টাকে সাদর অভিনন্দিত করে' ইহার ক্রমবিকাশে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—এবং এই শক্তি ইহাতে সন্নিবদ্ধ আছে বলেই রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, মহাদেব দেশাই, স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, স্যার আকবর হায়দরী, বরোদার মহারাজা গুইকুমার, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড ও লরেন্স বিনিয়ন প্রভৃতি ভারতীয় ও বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ একবাক্যে ইহার বহুমুখী শক্তি ও কি জাতীয় কি আন্তর্জাতিক জীবনে ইহার প্রভূত সম্ভাবিতব্যতার প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু কেবল ব্যক্তির শরীর গঠন ও চরিত্র গঠন করে' এবং মানুষে মানুষে ঐক্য সংস্থাপনের পন্থা নির্দ্ধারণ করে'ই ব্রতচারী ক্ষান্ত নয়। আজকাল জাতীয়তার এবং আন্তর্জাতিক সখ্য ও সমন্বয়ের মধ্যে যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়েছে ব্রতচারী তারও নিরাকরণের উপায় নির্দ্দেশ করে' দিচ্ছে। এই অনুচেষ্টায় আছে একাধারে একদিকে নিবিড় ভাবে জাতীয় সংস্কৃতির প্ররক্ষণ ও প্রবর্দ্ধনের আকুতি ও প্রণালী, আবার অপরদিকে জাতিতে জাতিতে পরস্পর সংস্কৃতির অনুসমীকরণের পদ্ধতি। অর্থাৎ একাধারে এতে আছে—স্বভূমি-প্রেমের ও সার্ব্ব-ভৌমিকতার সাধনা-পন্থা।

তাই বাংলার ব্রতচারী প্রচেষ্টা চায়—বাঙ্গালীকে নিবিড়ভাবে আত্ম-প্রবুদ্ধ, আত্ম-গৌরব-সচেতন ও আত্মনির্ভর করে' সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ ও সংহত করে' তুলতে। দেহের শক্তিতে, প্রাণের আনন্দে, কর্ম্মের পটুতায়, চরিত্রের দৃঢ়তায় ও লোকহিত-সাধনের উৎসাহে

তাকে পূর্ণশক্তিমান্ করে' ও পূর্ণ স্ব-স্থ করে' তুলতে। বাংলার পল্লীর নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব শিল্পধারা, নিজস্ব কলা, নিজস্ব নৃত্য, নিজস্ব গীত, নিজস্ব ভাব, ছন্দ, ধারা ও রূপ—এমন কি বাংলার পল্লীর ধূলিবালিকণা পর্য্যন্ত বাংলার ব্রতচারীর কাছে পরম পবিত্র। বাংলার এই নিবিড় ভূমিপ্রেমের চেতনাকে প্রত্যেক বাঙ্গালী বালকবালিকা ও নরনারীর প্রাণে জাগ্রত করে' ব্রতচারী চেষ্টা করছে—নাশ করতে বর্ত্তমান যুগের করাল সাম্প্রদায়িকতা-রাক্ষসীকে। এই অনুচেষ্টায় আছে সমান স্থান হিন্দুর, মুসলমানের, খৃষ্টানের, বৌদ্ধের ও জৈনের। বাংলার মাটিতে যাদের জন্ম অথবা বাংলাকে যারা মা বলে' স্বীকার করতে প্রস্তুত, তাদের সকলকে প্রেমের অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে বেঁধে আনন্দের ভিতর দিয়ে, কর্ম্মের ভিতর দিয়ে, পল্লী-সংস্কার কার্য্যের ভিতর দিয়ে, অর্থোপার্জ্জন ও ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে এবং সমাজসেবায় ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভিতর দিয়ে—ব্রতচারী এদের সকলকে এক অবিচ্ছিন্ন আত্মবিশ্বাসপূর্ণ আত্মসংহত শক্তিশালী জাতি করে গড়তে চায়। সকল বাঙ্গালীর মনপ্রাণ ও কণ্ঠকে সে করতে চায় সমতান ও সমচ্ছন্দ। তাই সে সৃষ্টি করেছে বাংলার নিখিল মানবের মিলিত কণ্ঠে মাতৃপ্রেমের আরাব—"জয় সোনার বাংলার"—"জ—সো—বা!"

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ব্রতচারী অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনা করি। এই ব্রতচর্য্যা পালন করলে প্রাণের আনন্দ, কর্ম্মের শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা ও লোকহিত-সাধনের উৎসাহ দেশে বললাভ করবে তাতে সন্দেহ নাই।"

বাংলার সংহতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রতচারী চায় ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশের মানুষকেও ঐ প্রণালীতে আত্মস্থ ও সংহত করে' বর্ত্তমান যুগের মহাশক্তিশালী 'মহাভারত' গড়তে। তাই ব্রতচারীর ডাক পড়েছে ও আদর হয়েছে—বরোদায়, হায়দ্রাবাদে, সিন্ধুদেশে, মাদ্রাজ প্রদেশে ও বিহারে। তাই আজ এই সকল সুদূর প্রদেশ

থেকে ভারতের নবশক্তির ও নবসংহতির সাধকগণ আসছেন বাংলার তীর্থে ব্রতচারী-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে। তাই আজ ভারতের দিগ্বিদিকে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠে সমস্বরে ও নির্ব্বিরোধে উচ্চারিত হ'চ্ছে ব্রতচারীর ঐক্যবিধায়ক মাতৃপ্রেমের আরাব—"জয় সোনার ভারতের"—"জ—সো—ভা!"

সার্থক ও সফল হউক বাংলার আত্মার ও ভারতের আত্মার এই নব-জীবনের ও পূর্ণ-জীবনের রূপায়ন-প্রচেষ্টা। রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতালাভের পূর্ণ সার্থকতা ও সফলতার জন্য আজ একান্ত প্রয়োজন আত্ম-সংস্কৃতির বিকাশের এবং কায়মনোবাক্যে শক্তিসাধনার ও ঐক্য-সাধনার এই অমোঘ ও আনন্দময় অনুষ্ঠানের।

ব্রতচারী-পরিচয়

ব্রতচারী-শক্তি

বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা যে সমগ্র মানব জাতিকে একটা ভ্রান্ত আদর্শের দিকে—একটা ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাচ্ছে, আজকাল এশিয়া-ইউরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এর উপলব্ধি করছেন। এটা বিশেষ করে বোঝা যায় আজকাল ইউরোপে গেলে এবং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে আলাপ করলে। ইউরোপে গিয়ে আমারও এই কথাটা বুঝবার বিশেষ সুযোগ হয়েছে। ইউরোপ জীবনের অনেক ক্ষেত্রে আশাতীত সফলতা লাভ করেছে ; কিন্তু সেই আশাতীত সফলতার মধ্যে ইউরোপের মনীষিগণ একটা চূড়ান্ত নিষ্ফলতার গভীর অনুভূতিতে ব্যথিত হচ্ছেন, যার বাহ্যিক রূপ আজকাল ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাপারে বিশ্বের সামনে বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক প্রগতির শতসহস্র সফলতার মধ্যে এই যে গভীর নিষ্ফলতার একটা চূড়ান্ত প্রকাশ, এর কারণ বিনির্দ্দেশ এক কথায় করতে হলে, বলতে হয়—বর্ত্তমান যুগে জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ থেকে মানবজাতির বিচ্যুতি।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ আজকাল হাহাকার করে চীৎকার করছেন—চাই জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ। কেউ তা খুঁজছেন প্রাচীন গ্রীক-সংস্কৃতির মধ্যে, কেউ খুঁজছেন খৃষ্ট-ধর্ম্মের নৈতিক

আদর্শের মধ্যে, আর কেউ বা খুঁজেছেন নবযুগের রাশিয়ার কমিউনিষ্ট আদর্শে।

ভারতের জীবনে প্রাচীনকালে মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ অখণ্ড আদর্শের প্রকাশ হয়েছিল ; এবং ভারতবর্ষ থেকে এই অখণ্ড আদর্শ পৃথিবী যে আবার পাবে, এই আশা ও বিশ্বাস ইউরোপের কয়েকই মনীষীর মনে ক্রমশই গভীরতর ভাবে বদ্ধমূল হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, ব্রতচারী-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ বর্ত্তমান জগৎকে তার নিজস্ব অখণ্ড আদর্শমূলক সংস্কৃতির বহুমূল্য দান আবার করতে উদ্যত হয়েছে—এটা উপলব্ধি করে তাঁরা ব্রতচারী পরিচেষ্টাকে অতি সমাদরে বরণডালা দিয়েছেন।

কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে, ব্রতচারীর এই বৃহত্তর মর্ম্মার্থ এবং সম্ভাবিতব্যতার উপলব্ধি ভারতে এবং বাংলায় এখনও খুব কম লোকেরই হয়েছে। এখন সময় এসেছে, এই বৃহত্তর উপলব্ধি-জাগরণের ; এবং তার ফলে বাংলার ও ভারতের জীবনকে বর্ত্তমান অধঃপতনের গভীর গহ্বর থেকে টেনে তুলে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে চালিত করবার ; আর তার দৃষ্টান্ত দিয়ে পৃথিবীর জীবনকে পরিপূর্ণ আদর্শের পথে পরিচালিত করবার।

আধুনিক যুগে মানুষ তার জীবনকে বহুধা খণ্ড-বিখণ্ড করেছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ; যথা—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিক্ষা, ক্রীড়া,—দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বিভিন্নক্ষেত্র এবং প্রত্যেকের উপযোগী বিভিন্ন সাধনার মধ্যে—জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার বিভিন্ন কোঠায়। জীবনের এই খণ্ড-বিখণ্ডতার ফলে বর্ত্তমান সভ্যতা অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং জড়জগতে অভাবনীয় শক্তিলাভ সত্ত্বেও গভীর নিস্ফলতায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

ব্রতচারী পদ্ধতিতে মানুষের জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ আদর্শের সমাবেশ হয়েছে, এর অনুভব যে বিশ্বের মানব-সভায় এসেছে তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। ইউরোপে তিনটি

বিশ্বমানব মহাসভার অধিবেশন হয়েছিল। একটি ধর্ম্ম-বিষয়ক—সর্ব্বধর্ম্ম-মহাসভা (World Congrees of Faiths); এটা হয়েছিল লণ্ডনে; মহারাজা গাইকোয়ার এর অধিনেতা এবং স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজ্ব্যাণ্ড এর আহ্বানকারী। দ্বিতীয়টি ইংলণ্ডের চেল্টনহ্যাম শহরে—বিশ্বশিক্ষা-মহাসভা (Seventh World Conference of the New Education Fellowship); তৃতীয়টি জার্ম্মানীর হ্যামবার্গ (Hamburg) শহরে আহূত হয়েছিল—তার নাম ক্রীড়া ও পুনঃপ্রাণন (World Congress for Leisuretime and Recreation)।

এই তিনটি অতি-বিভিন্ন ব্যাপারের বিশ্ব-মহাসভায় ব্রতচারীর সমান সাদর নিমন্ত্রণ যে আসতে পারে, একথা অনেকেরই হয়তো বিশ্বাস হবে না; কিন্তু সত্যই ইহা ঘটেছিল। এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি?—এই বুঝতে পারছি যে, বর্ত্তমান যুগে বিশ্বের মানুষ তার জীবনকে বিভক্ত করেছে ভিন্ন ভিন্ন কোঠায়; যথা—ধর্ম্ম, শিক্ষা (দৈহিক, মানসিক, নৈতিক), ক্রীড়া ইত্যাদি। কিন্তু এই তিন বিভিন্ন কোঠা থেকে তারা একসঙ্গে হাত বাড়াচ্ছে ব্রতচারীর পরিপূর্ণ ভাণ্ডারে। এক ব্রতচারী আদর্শই তাদের পারস্পরিক বিভিন্নতাকে বিচূর্ণ করে তাদের মধ্যে গভীর এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে পারবে; বিশ্বমানুষের বর্ত্তমান শতধা খণ্ড-বিখণ্ড জীবনকে আবার পরিপূর্ণতা সন্ধান দিতে পারবে।

তাই লণ্ডনে ক্যাক্সটন হলে বাংলার নিজস্ব পল্লী-রসকলা সম্বন্ধে আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তখন সভাপতির আসন থেকে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি ও শিক্ষাচার্য লরেন্স বিনিয়ন বলেছিলেন—

সমগ্র পৃথিবীজুড়ে—বিশেষ করে পশ্চিম জগতে—আমাদের বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে আমরা কেমন করে যেন জীবনের সমগ্রতা হারিয়ে ফেলেছি—কেমন করে যেন জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলেছি।

দত্ত মহাশয় ব্রতচারী ও অন্যান্য যে সব পরিচেষ্টা আরম্ভ করেছেন—আমার মনে হয়, তাদের লক্ষ্য জীবনের এই সমগ্রতা এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির লুপ্ত সংযোগ পুনঃস্থাপন করা।

তাই বলি, বাংলার মানুষ বুঝুক তাদের আজ কি মহা গৌরবময় অধিকার এসেছে। বিশ্ব আজ গভীর অন্ধকারের মধ্যে যে আলোর জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছে, সেই আলোর মশাল জ্বালিয়ে তুলে বিশ্ব-প্রগতির পথ দেখাবার—ব্রতচারী আদর্শকে সমগ্র বাংলার জীবনে সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়ে তুলে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পরিপূর্ণ আদর্শের জীবন্ত দান বিশ্বকে করবার এই বিরাট অধিকার বাঙ্গালী আজ গ্রহণ করুক, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে—বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া নির্ব্বিশেষে—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে।

ব্রতচারী আদর্শ শুধু একটা নাচ-গানের ব্যাপার—এই মূঢ় বিশ্বাস যাদের মধ্যে এখনও আছে, তাদের সে ভ্রান্তবিশ্বাস আজ ঘুচুক। ফুটবল, ক্রিকেট, স্কাউটিং নানাবিধ খেলার এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নানাপ্রকার জ্ঞান-বিকাশের প্রয়োজন যে নেই, তা আমরা বলি না; কিন্তু এগুলির সঙ্গে ব্রতচারীর পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার তুলনা যে করে, সে বর্ত্তমান যুগের সমস্যা ও তার সমাধানের পন্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কেউ কেউ আবার বাংলার ব্রতচারী আদর্শকে "প্রাদেশিকতা" মাত্র বলে ভ্রম করেন। তাঁদের বুঝতে হবে, তাঁরা যাকে প্রাদেশিকতা মনে করেন, সেটাই আসল জাতীয়তা। বিভিন্ন প্রদেশ নির্ব্বিশেষে ভারতের সংস্কৃতির একটা সমতার বৈশিষ্ট্য যে আছে, এটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এটা ভুললে আর চলবে না যে, সমগ্র ভারতের সম-সংস্কৃতির মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের জাতীয়তার যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য, তাকে উপেক্ষা আমরা যতদিন করব, ততদিন কি ভারত মানবতা, কি বিশ্ব-মানবতার ঐক্যের সন্ধান পাওয়া আমাদের সম্ভব হবে না!

মোট কথা—রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যাকে প্রাদেশিকতা বলা চলে, সংকৃষ্টির ক্ষেত্রে সেটা মানুষের জীবনের মূলীভূত গভীর জাতীয়তার বৈচিত্র্যের প্রকাশ। সেই সংকৃষ্টিগত জাতীয়তার বৈচিত্র্যকে সাদরে স্বীকার করে, তার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় লাভ করে তাকে যদি বাংলার জীবনে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা বাঙ্গালী না করে—প্রাদেশিকতার খোঁটার ভয়ে লজ্জায় ও সঙ্কোচে বাঙ্গালী যদি এখনও বাংলার নিজস্ব জাতীয় বৈচিত্র্যকে তার জীবনে গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলবার সাধনা না করে, তা হলে সে না পারবে বাংলাকে, না পারবে বিশ্বকে সেই দান দিতে, যে দানের জন্য ভগবান্ বাঙ্গালীকে বাংলার মাটি, হাওয়া, জল, ফুল, ফলের—বাংলার ভাষা, কলা, নৃত্য ও গানের সম্পদের উত্তরাধিকারী, অথবা এক কথায়, বাংলার শক্তির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমাদের জাতীয়তার প্রকৃষ্ট পরিণতি ও পরিচয় হবে বাংলার সংকৃষ্টির নিবিড় প্রকাশে.; একমাত্র তাতে করেই আমরা ভারত-মানবতার ও বিশ্ব-মানবতার ক্ষেত্রে আমাদের বৈশিষ্ট্যের দান করতে পারব। নতুবা আমাদের জীবন হবে অর্থহীন ও মূল্যহীন।

ব্রতচারী আদর্শে একদিকে যেমন আছে, প্রত্যেক বিশিষ্ট জাতির নিজস্ব বৈচিত্রময় সংকৃষ্টি-বিকাশের সাধনা-পন্থার নির্দ্দেশ, অপর দিকে তেমনি আছে বিশ্বমানবের সেবাধর্ম্মের প্রতি নির্দ্দেশ। দেহের, মনের, চরিত্রের এবং আধ্যাত্মিক প্রগতির সাধনা-পন্থা এতে একাধারে নিহিত আছে; তার সঙ্গে আছে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংকৃষ্টির ক্রমধারার সাধনা-পন্থার গতি-নির্দ্দেশ; আর সর্ব্বোপরি আছে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ কি ধর্ম্মে, কি ক্রীড়ায়, কি শিক্ষায়, কি দৈহিক মানসিক চারিত্রিক ক্ষেত্রে, কি ব্যক্তিগত কি সমষ্টিগত জীবনে—আনন্দের অপূর্ব্ব অভিসিঞ্চন। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সাধনার দিক থেকে আনন্দের উপর সবচেয়ে এই যে বলিষ্ঠ অনু-বিধান—সহজ সরল নৃত্য-গীতের ভিতর দিয়ে শব্দ ও গতিছন্দের

এই যে আনন্দময় সাধনা—একে আজ জগতের শিক্ষা-বৈজ্ঞানিকগণ ব্রতচারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এবং ব্রতচারীর মধ্য দিয়ে বর্ত্তমান জগৎকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন! আর এটাও স্বীকার করছেন যে, ব্রতচারীর পঞ্চব্রত—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দ—এর ভেতর দিয়ে ভারতের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ে ব্রতচারী-প্রতিভার বর্ত্তমান যুগোপযোগী পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে।

ব্রতচারীর পণ-মানা যাঁরা এখনও ছেলেখেলার জিনিষ বলে মনে করেন, তাঁদের এখন বুঝবার সময় এসেছে যে, এগুলি ছেলে-খেলা নয়; এগুলি মানুষের পরিপূর্ণ অখণ্ড জীবন-আদর্শের মন্ত্র-সাধনার সহজ অথচ গভীর ফলপ্রসূ প্রণালী। এই মন্ত্র-সাধনার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চর্চ্চার ভিতর দিয়ে বাঙ্গালী শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আবার নিজেকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত ভাবে—কি দৈহিক—কি মানসিক—কি চারিত্রিক—কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, মহা শক্তিমান্ করে তুলবে। ব্রতচারী-আদর্শের সাধনা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্বভার গ্রহণ করবার গৌরবময় অধিকার বাঙ্গালী নরনারীর করায়ত্ত করে দেবে। ব্রতচারী-শক্তি ভারতকে এবং বিশ্বকে সর্ব্বসমন্বয়পূর্ণ এক নূতন পথে পরিচালিত করে মানুষের জীবনে পূর্ণ সার্থকতার সন্ধান এনে দেবে।

ব্রতচারীর ছন্দ-সাধনা

ব্রতচারী পরিচেষ্টায় যে পরিপূর্ণতার সমাবেশ রয়েছে, ব্যক্তির এবং জাতির বাস্তব জীবনে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে ব্রতচারী-আদর্শের সম্যক্ উপলব্ধির প্রয়োজন। এই সম্যক্ উপলব্ধির অভাবে এদেশে আজকাল অনেকে ব্রতচারী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন এবং একে একটা নৃত্যের পদ্ধতি বলে মনে করেন। ব্রতচারী পরিচেষ্টার মধ্যে নৃত্যের যে একটি বিশেষ স্থান আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নৃত্য এর একটা সাধন-পন্থা মাত্র, ইহার লক্ষ্য স্থানীয় নয়, এমন কি প্রধান কৃত্যও নয়। শ্রীমতী সরলা দেবী বলেছেন যে, নৃত্য ব্রতচারী-প্রগতির বাইরের শরীরটা মাত্র; তার ব্রতগুলি হচ্ছে তার ভিতরের আত্মা। ব্রতচারী অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য এবং কৃত্য যদি নৃত্যই হত, তাহ'লে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বলতেন না—"এই ব্রতচর্য্যা পালন করলে প্রাণের আনন্দ, কর্ম্মের শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা ও লোকহিত-সাধনের উৎসাহ দেশে বললাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।" এ থেকে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বোঝা উচিত যে ব্রতচারীকে বুঝতে হলে তার আত্মাস্বরূপ ব্রত এবং পণ-মানাগুলিকে বিশেষ করে বুঝতে হবে। যাঁরা এটাকে একটা নাচের হুজুগ মনে করবেন, তাঁরা শুধু নিজেদের পল্লবগ্রাহিতার পরিচয় দেবেন মাত্র।

এখন প্রশ্ন হবে, ব্রতচারী যদি শুধু নাচ-গান না হয়, তবে ব্রতচারী কি? আমরা আগেই বলেছি—ব্রতচারী মানুষের জীবনের পূর্ণসিদ্ধির পূর্ণাঙ্গ সাধনা। বাস্তবপক্ষে কেবল মানুষের জীবনের নয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণসিদ্ধির পূর্ণাঙ্গ সাধনার উপকরণ এতে রয়েছে। এটা আমরা যতই তলিয়ে দেখব, ততই বুঝতে পারব। এই পূর্ণসিদ্ধি এবং পূর্ণাঙ্গ সাধনাকে দুই দিক থেকে দেখা যায়। একটা লক্ষ্যের দিক থেকে—একটা সাধনা-পন্থার দিক থেকে।

লক্ষ্যের দিক থেকে ব্রতচারীর পরিপূর্ণ আদর্শ আমরা পাই জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দ—এই পঞ্চব্রতের মধ্যে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, কি বৌদ্ধ, এই পঞ্চব্রতের মধ্যে সকলেই সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয়ের একটা সমসাধারণ পরিপূর্ণ আদর্শ পাচ্ছেন। ব্রতচারী নিজেকে একটা ধর্ম্ম বলে জাহির করে না; কিন্তু ব্রতচারী এই দাবী করে, যিনি যে ধর্ম্মের লোকই হন, ব্রতচারীর এই পঞ্চব্রত-মূলক আদর্শ গ্রহণ করলে তিনি তাঁর নিজের ধর্ম্মের মর্ম্মকথা আরও গভীরভাবে এবং আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। এটাও সাহস করে বলা যেতে পারে যে, কোন কোন ধর্ম্মের আদর্শের মধ্যে শ্রমের এবং আনন্দের স্থান বিশেষ ভাবে লক্ষ্য হয় না; এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে অনেক ধর্ম্মের বিরোধ ঘটেছে বা ঘটবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ব্রতচারীর পঞ্চব্রতমূলক আদর্শে এমন একটা অভিনব আধ্যাত্মিক সমন্বয় বিশ্বমানবকে দান করা হয়েছে, যাতে করে সে পূর্ণাঙ্গ যোগের অতি সহজ প্রণালীর সাধনা সাংসারিক জীবনের মধ্যে অতি সহজভাবে করে নিতে পারবে।

এটা হলো লক্ষ্যের দিক থেকে। কিন্তু খালি মানসিক লক্ষ্যে—কি কর্ম্ম-জগতে, কি আধ্যাত্মিক জগতে—সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। সাধারণ লোকের পক্ষে জীবনের পূর্ণযোগে সিদ্ধিলাভ করতে হলে ছন্দাত্মক সাধনার পথ অবলম্বন করতে হবে। এই সত্যটি ব্রতচারীর একটা বৈশিষ্ট্যমূলক আবিষ্কার।

সুতরাং আমরা ব্রতচারীতে প্রধানতঃ পাই এই দু'টী উপাদান—পঞ্চব্রত এবং ছন্দাত্মক সাধনা।

ছন্দাত্মক সাধনার প্রয়োজনের বিষয়ে আমরা এখন বিশেষ করে আলোচনা করব। দু-একজন মহাত্মা অথবা ঋষির পক্ষে নিস্তব্ধ ধ্যান-শক্তির প্রয়োগদ্বারা চরিত্রের উপর পূর্ণ আয়ত্তস্থাপন, দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয় এবং অদ্বৈততা-অনুভূতি এবং জীবাত্মার সঙ্গে অনন্তের সংযোগ-সাধন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের

পক্ষে তা অসম্ভব। সাধারণ লোককে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, যেতে হবে ছন্দাত্মক সাধনার পথ দিয়ে। এটা ব্রতচারীর একটা মূলীভূত কথা। যে সত্যের উপর ব্রতচারীর এই বৈশিষ্ট্যমূলক আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত, তা-ই তাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বযুগে মানুষের জীবনের পূর্ণযোগসাধনার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রণালীর আসনে স্থান দেবে, এ নিঃসন্দেহ।

এক কথায় বলতে গেলে, এটা বলা চলে যে তুমি যদি ব্রতচারী না হও, তা হলে তুমি পূর্ণ নও। ব্রতচারীর ছন্দ-সাধনা যদি না করে থাক তা হলে বাস্তবিক পক্ষে তুমি অশিক্ষিত—হও তুমি বড় বৈজ্ঞানিক, হও তুমি বড় দার্শনিক, হও তুমি বড় রাষ্ট্রনেতা। কেন না, যদি তোমার ছন্দ-সাধনা না হয়ে থাকে, তা হলে বিশ্বমানবের জীবনের সঙ্গে তোমার ঐক্য অথবা অদ্বৈততার আশা দূরে থাকুক, তোমার নিজের মধ্যেই তুমি দেহ, মন ও আত্মার বিরোধ ক্ষালন করে সমন্বয় এবং সমগ্রতা স্থাপন করার প্রাথমিক প্রণালীর অভ্যাস কর নি। ছন্দের অভ্যাস যে করেনি, তার জীবন অপূর্ণ, অন্তর্বিরোধময়।

কেহ যেন মনে না করেন যে, এটা একটা অবৈজ্ঞানিক খাম-খেয়ালী কথা। শ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো—যিনি সমগ্র আধুনিক ইউরোপ-আমেরিকার মন্ত্রগুরু—তিনি স্বয়ং এই কথার সত্যতা বুঝে ঘোষণা করে গিয়েছেন এবং বলেছেন, যে মানুষ ছন্দের শিক্ষা না পেয়েছে, যে মানুষ নৃত্য ও গীতের অভ্যাস না করেছে, সে মানুষের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ; সে বাস্তবিক শিক্ষিত নয়। প্লেটোর বিধান অবলম্বন করে গ্রীসের প্রত্যেক রাজ্য নৃত্যসাধনাকে প্রত্যেক মানুষের এবং প্রত্যেক বালক-বালিকার—এমন কি, প্রত্যেক যোদ্ধার—শিক্ষার ও সাধনার একটা প্রধান ও অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করেছিল, এবং তাই আজ আধুনিক জগতের লোক প্রাচীন গ্রীকদের কি শারীরিক কি মানসিক সৌন্দর্য্যের সমন্বয়ের এবং শক্তির অভাবনীয় প্রকাশ দেখে বিস্মিত হয়। মোটকথা, ছন্দাত্মক সাধনাই

২

ছিল গ্রীসের সর্ব্বতোমুখী সিদ্ধির গূঢ় পন্থা। সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্‌কে জীবনে আনতে হলে ছন্দাত্মক সাধনা ছাড়া উপায় নেই, এটা আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনেতাগণকে এবং বর্ত্তমান শিক্ষানেতাগণকে বুঝতে হবে; এবং বুঝে কার্য্যক্ষেত্রে তদনুরূপ বিধান করতে হবে— নিজের জীবনে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে।

এটা আমরা বলছি খালি প্লেটোর কথা এবং গ্রীসের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে নয়। গ্রীসের জন্মের বহুপূর্ব্বে ভারতের মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ছন্দাত্মক রহস্যের কথা আবিষ্কার করে ঘোষণা করেছিল। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে একটা অখণ্ড সত্তা এবং সেই অখণ্ড সমগ্র সত্তার এবং তার প্রতি অংশের প্রতি অণু-পরমাণু যে অবিরাম গতিশীল ও ছন্দশীল, এই সত্য বিশ্বের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে আবিষ্কৃত ও ঘোষিত হয়েছিল ভারতভূমিতে। পাশ্চাত্য জগতে এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করতে দু'তিন হাজার বছর লেগেছে, এবং তার আগে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কথা দূরে থাকুক—কেবল মাত্র পৃথিবী যে চলমান ও ছন্দশীল, এই কথাটুকু বলার স্পর্দ্ধার জন্য গেলিলিও প্রভৃতিকে প্রাণদান করতে হয়েছিল। তার বহু সহস্র বছর আগে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে একটা গতিশীল ও ছন্দশীল সত্তা, তা তার 'জগৎ' আখ্যা থেকে ভারতের ছোট বড় প্রত্যেক মানুষের একটা দৈনন্দিন সাধারণ জ্ঞানের বিষয় ছিল; এবং খালি জ্ঞানের বিষয় নয়, কর্ম্মের ক্ষেত্রে এবং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের মর্ম্ম-কথা কার্য্যত প্রয়োগ করা হয়েছিল ছন্দের সাধনায়। ভারতের জীবনে তখন কর্ম্মে এবং ধর্ম্মে বিযুক্ততা ছিল না; কর্ম্ম ছিল ধর্ম্মাত্মক এবং ধর্ম্ম ছিল কর্ম্মাত্মক এবং উভয়ই ছিল ছন্দাত্মক। এক কথায় জীবনের সাধনা ছিল অখণ্ড এবং ছন্দের দ্বারা সমন্বিত। তা ছিল বলেই প্রাচীন ভারত আধ্যাত্মিক জীবনে এবং দর্শনের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ব্যাপী প্রাধান্য এবং প্রখ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

কেবল যে হিন্দু-ধর্ম্মেই ছন্দ-সাধনার পন্থা গৃহীত হয়েছিল, তা নয়। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রথম যুগেও ছন্দের সাধনা ঐ ধর্ম্মের উপাসনার একটা প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ ছিল। এটা আমাদের মনগড়া কথা নয়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী হ্যাভেলেক এলিস্ (Havelock Ellis) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ডান্স্ অব লাইফ্" (জীবন-নৃত্য)-এ এ কথাটা অতি স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি আক্ষেপ করেছেন, নৃত্যের সঙ্গে ধর্ম্মসাধনার বিচ্যুতি যে দিন হয়েছে, সেদিন থেকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম তার আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়েছে এবং তিনি বলেছেন, আবার যদি ইউরোপে বর্তমান পণ্ডিতী ও পৌরোহিত্য-প্রধান ধর্ম্মের স্থলে কখনো একটা জীবন্ত ও প্রাণবান্ ধর্ম্ম আসে, তবে সে একটা নৃত্যের রূপেই আসবে।

সমষ্টিগত ভাবে ছন্দের একটা বিরাট ঐক্য-সংগঠনী শক্তি আছে। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোকে যখন অতি সহজ ভাবে কায়, মন ও বাক্যের সহজ ছন্দে সমন্বিত হয়, তখন তাদের মধ্যে এক অভাবনীয় ঐক্য এবং অদ্বৈততার স্মজন হয়।

ব্যক্তির ও সমষ্টির জীবনে কায়, মন ও বাক্যের ছন্দ-সাধনার এই যে বিরাট ঐক্য-বিধানেরও আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সম্পাদনের অমোঘ শক্তি—ইহাই ব্রতচারী-নৃত্যের প্রাণবস্তু। ব্রতচারীর বৈশিষ্ট্য এই যে, বর্ত্তমান যুগে মানুষের জীবনকে প্রাণবন্ত এবং সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তিমান্ করে তোলবার জন্য ব্রতচারী এই ছন্দ-সাধনার অমোঘ শক্তিকে কোন বিশেষ কোঠায় আবদ্ধ করে রাখে নি। কর্ম্ম, ক্রীড়া এবং শিক্ষা নির্ব্বিশেষে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ছন্দের অভিসিঞ্চন মানুষের জীবনে পূর্ণ সিদ্ধিলাভের পথ সহজ করে দেয়। সুতরাং ব্রতচারী-নৃত্য যে একটা হাসির, বিদ্রূপের, তাচ্ছিল্যের, অথবা কেবল মাত্র একটা বাহ্যিক অভিনয়ের বস্তু নয়, এই কথা যে বুঝতে না পারবে, সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মুলীভূত ছন্দশক্তির মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ।

শক্তি-সাধনা

পৃথিবীর সব দেশে সব মানুষের এক আকাঙ্খা—চাই শক্তি !—স্বাস্থ্যের শক্তি ও অর্থের শক্তি। এই দুই শক্তি লাভের জন্য আমরা চাই—দেহের শক্তি, মনের শক্তি, চরিত্রের শক্তি ও আত্মার শক্তি।

মানুষ চায় এই সব শক্তি, কিন্তু আধুনিক জগতে প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে মানুষ শক্তি-সাধনার পন্থা সম্বন্ধে, হয় অনভিজ্ঞ, নয় ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী।

ব্রতচারী-আদর্শে এই সমস্যার অতি সহজ সমাধান হয়েছে। মানুষের জীবনে সর্ব্বতোমুখী শক্তিসাধনের পরিপূর্ণ পন্থার নির্দ্দেশ করা হয়েছে ব্রতচারীর পঞ্চব্রতে :—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ—এই পঞ্চবিধ সাধনা-পন্থায়।

যে কোন ধর্ম্ম খুঁজুন, যে কোন নীতিশাস্ত্র খুঁজুন, অথবা যে কোন শিক্ষা-বিজ্ঞানপ্রণালী খুঁজুন, তাদের মূলীভূত আদর্শ ও প্রণালীগুলি এই পঞ্চব্রতের অন্তর্ভূক্তরূপে প্রতিপন্ন হবে। কি শারীরিক শক্তি, কি মানসিক শক্তি, কি চরিত্রের শক্তি, কি আধ্যাত্মিক শক্তি, এদের পূর্ণ সাধনার, জন্য এই পঞ্চবিধ পন্থার সাধনা প্রয়োজন—অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনা, শ্রমের (কর্ম্মের) সাধনা, ঐক্যের সাধনা ও আনন্দের সাধনা। আবার এই সব সাধনার মূলীভূত হচ্ছে শেষোক্ত দুইটি—অর্থাৎ ঐক্য ও আনন্দের সাধনা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে একটা মহা-ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই ধারণা আমাদের যদি জ্ঞানবুদ্ধিগত এমন কি অস্থিমজ্জাগত না হয়, তবে আমাদের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা ও সকল কর্ম্মের সাধনা পণ্ড হবে। জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে তার মূলীভূত ঐক্যটিকে হৃদয়ঙ্গম করে তার সাধনা আমাদের করতে হবে—ব্যক্তির জীবনে, জাতির জীবনে,

বিশ্বমানবের জীবনে—এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবনে। আজকাল বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে মানুষ জীবনের ও জগতের বাহ্যিক বৈচিত্র্যের মধ্যে জগতের মূলীভূত ঐক্যের সন্ধান হারিয়েছে বলেই বর্তমান জগতের জীবন বিরোধময়, দ্বন্দ্ব ও কলহময়, যুদ্ধ ও বিগ্রহময়।

সুতরাং এর নিরাকরণ করে জগতে শান্তি ও সখ্য আনতে হলে, চাই ব্রতচারীর চতুর্থ ব্রত ঐক্যের সাধনা।

কিন্তু এই ঐক্যের সাধনাকে সফল করে তুলতে হলে, সর্ব্বাগ্রে চাই ব্রতচারীর পঞ্চম ব্রত আনন্দের সাধনা।

বর্তমান জগতের জীবন জগৎ-সৃষ্টির ও জগৎ প্রকৃতির মূলীভূত আনন্দের সন্ধান ও সাধনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলেই বর্তমান সভ্যতা আজ নিরানন্দের পথে, কলহের পথে চলেছে।

বিশ্বের জীবনে ঐক্যের ও আনন্দের সাধনার মূলীভূত প্রণালী হচ্ছে ছন্দ। প্রকৃত আনন্দ ছন্দাত্মক ও প্রকৃত ঐক্যও ছন্দাত্মক। ছন্দের সমন্বয় না হলে যেমন প্রকৃত আনন্দ লাভ করা অসম্ভব, সেইরূপ ছন্দের সমন্বয় না হলে কি ব্যক্তির জীবনে কি সমষ্টির জীবনে ঐক্য-গঠন অসম্ভব। এর একটা সহজ অথচ পরিষ্কার উদাহরণ দেখা যায় সামরিক ক্ষেত্রে সৈন্যদের সমছন্দতার অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তায় ও শক্তিমত্তায়।

সামরিক ড্রিলের মূলীভূত বস্তু হচ্ছে ছন্দের সমন্বয়। ছন্দ-সমন্বয়ের অভ্যাস ব্যতীত সামরিক বিদ্যার উপশীলন যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, তা সকলেই জানেন। পায়ে পা মিলিয়ে চলা, ছন্দোবদ্ধ প্রণালীতে কুচ-কাওয়াজ করা—এগুলিই হচ্ছে শত শত সহস্র সহস্র বিযুক্ত অল্পশক্তি ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী করে তুলবার প্রণালী,—এগুলিকে ড্রিলই বলুন, কুচকাওয়াজই বলুন, অথবা খুব ব্যাপক অর্থে

নৃত্যই বলুন—এটা ঠিক, যে এগুলি সমছন্দতার অথবা ছন্দ-সমন্বয়ের সাধনা। এর থেকেই আসে সৈন্যদলের ঐক্য ও শক্তি। সুতরাং সমছন্দ সাধনা যে ঐক্য ও শক্তির মূলীভূত, সে বিষয়ে যে কোন সন্দেহের স্থান নেই, এটা বোধহয় এখন স্বীকৃত হবে। জীবনের সব ক্ষেত্রে ছন্দের এই শক্তিমত্তা পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আজকাল প্রতিপন্ন হচ্ছে। এমন কি, শ্রমের ক্ষেত্রে এবং শিল্পকার্য্যের ক্ষেত্রেও ছন্দাত্মক ক্রিয়া-প্রণালীর উপযোগীতা ও ফলবত্তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হচ্ছে।

পাশ্চাত্য জগৎ আজ যে সত্যটি বহু শতাব্দীর গবেষণার ফলে আবিষ্কার করছে, ভারতে তা বহু শতাব্দী আগে থেকে সাধারণের নিত্যজ্ঞান-বস্তু ছিল। কেবল যে ছন্দের সাধারণ উপযোগীতা ও ফলবত্তা সম্বন্ধে ভারতে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান ছিল—তা নয়, প্রত্যেক মানুষের যে একটা নিজস্ব স্বাভাবিক ছন্দ আছে এবং প্রত্যেক জাতির ও দেশের যে একটা নিজস্ব স্বাভাবিক ছন্দ আছে, তাও সর্ব্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সহজ অনুভূতির বস্তু ছিল। এর প্রমাণ দুটো শব্দের দ্বারা দেওয়া চলে—এই দুটো শব্দ হচ্ছে—'স্বাস্থ্য' ও 'স্বচ্ছন্দ'। স্বচ্ছন্দ কথাটা যখন বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তার মানে—স্বাধীন, বাধাশূন্য, সুস্থ, অযত্ন-জাত। আর যখন বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তার একটা মানে—স্বাস্থ্য। 'স্বাস্থ্য' কথাটার আসল মানে হয়ত অনেকে তলিয়ে দেখেন না। এর মনে হচ্ছে 'স্বস্থ' হওয়ার অবস্থা—অর্থাৎ আত্ম-প্রকৃতিস্থ হওয়ার অবস্থা।

সুতরাং 'স্বচ্ছন্দ' ও 'স্বাস্থ্য' এই দুটো কথার ভাবার্থের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতবর্ষে আপামর সাধারণ লোকের এক কালে সহজ জ্ঞান ছিল যে, প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব

স্বাভাবিক ছন্দ আছে—যেটা তার স্ব-চ্ছন্দ, আর যখনই সে স্বচ্ছন্দ হয়, তখনই সে স্ব-স্থ, তখনই সে স্বতঃই স্বাধীন ও বাধাশূন্য ও সুস্থ। যখনই সে স্বচ্ছন্দতা হতে বিচ্যুত হয়, তখনই সে তার মুক্তি ও স্বাধীনতা হারায়, তখনই সে স্বাস্থ্য হারায়, তখনই তার জীবন বাধাগ্রস্ত ও অসুস্থ হয়।

ছন্দ এবং বিশেষতঃ স্ব-ছন্দ যে সকল স্বাস্থ্যের, সকল শক্তির ও সকল মুক্তির মূলীভূত, এবং প্রাচীনকালে ভারতের আপামর সাধারণ যে এটা এক দিক থেকে বৈজ্ঞানিক ভাবে, ও অপর দিক হতে অতি সহজে উপলব্ধি করেছিল, তা আমরা এর থেকে বুঝতে পারছি।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ভারতের শিক্ষিত লোককেই আজ নূতন করে বোঝাবার প্রয়োজন হয়েছে যে মানুষের জীবনে সর্ব্বক্ষেত্রে শক্তির ও স্বাস্থ্যের মূলীভূত জিনিষ হচ্ছে ছন্দ ও স্ব-ছন্দ; খালি তা নয়—অনেক শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত লোক ব্রতচারীর এই মূলীভূত সত্যটিকে অবজ্ঞার, হাসির, ঠাট্টার ও বিদ্রূপের দ্বারা উড়িয়ে দিতে চান। এতে করে যে তাঁরা তাঁদের নিজের দেশের সংস্কৃতির বিষয়েই শোচনীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাতে সন্দেহ নাই।

ব্রতচারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ হতে পারে না। এসব আত্মসংস্কৃতি-বিস্মৃত লোক আমাদের বিরাগভাজন হবেন না, তাঁরা হবেন আমাদের কৃপার্হ। অসীম ধৈর্য্যের, প্রেমের ও কর্ম্মের সাধনায় শত বিদ্রূপ, শত অবজ্ঞা, শত অন্ধতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এই সব আত্মবিস্মৃত লোকদের মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-চক্ষুর পুনর্বিকাশ ও পুনরুন্মীলন করবার অবিচল চেষ্টা করতে থাকব। বাংলার প্রত্যেক নর-নারীকে আমরা আবার তাদের স্ব-ছন্দের সন্ধান এনে দিয়ে তাদের জীবনকে পরিপূর্ণতার পথে পরিচালিত করব। বিশ্ব-

মানবের জীবনে আবার স্ব-ছন্দের সন্ধান এনে দিয়ে আমরা তাকে তার পরিপূর্ণ দিব্য লক্ষ্যের পথে চালিত করব।

এই ভুবন-সেবার মহাব্রত গ্রহণ করব আমরা বাংলার ব্রতচারী।

শত বাধাতে, শত ভ্রান্ত সমালোচনার তীব্র আঘাতে, শত শত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধতায়ও আমাদের এই মহাসেবাব্রতের সাধনার ব্যাঘাত হবে না।

সত্য আমাদের চির-সহায়, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

বাংলার স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা

এটা আজকাল বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারি, সবই মূলতঃ একটি সূক্ষ্ম নিরাকার শক্তির স্পন্দন মাত্র। এই স্পন্দন ছন্দমূলক ; আমাদের স্থূল অনুভূতি দ্বারা আমরা সব জিনিষে এই ছন্দাত্মক স্পন্দনের উপলব্ধি করতে পারি না ; কিন্তু আমাদের উপলব্ধির অক্ষমতা সত্ত্বেও সব জিনিষের অণুপরমাণুতে সেই ছন্দময় স্পন্দনের অনন্ত উপস্থিতি রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের শরীরের প্রতি অণুপরমাণুতে এই ছন্দময় স্পন্দনের প্রবাহ প্রতি মুহূর্তে বয়ে চলেছে। আমাদের মনের চিন্তাবৃত্তিও এই ছন্দময় স্পন্দনের একটি প্রকাশ মাত্র।

মানুষের জীবনে ছন্দময়ী বিশ্বপ্রকৃতির মূলীভূত এই ছন্দাত্মক স্পন্দনের দুটো প্রকার আছে। একটা তার শরীর ও মনের প্রত্যেক অংশের ও প্রত্যেক অণুপরমাণুর ছন্দ-ধারা—যেটা তারা ইন্দ্রিয়ে অজ্ঞাত ; অন্যটি হচ্ছে জ্ঞানতঃ অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত ছন্দ-শক্তির সাহায্যে তার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের ও মনোবৃত্তির সমন্বয়ীকৃত চালনার শক্তি। এই দ্বিতীয় শক্তির অন্যতম নাম জীবনী-শক্তি। জীবিত প্রাণী আর জড় পদার্থ, এই দুটোর প্রত্যেকের অণুপরমাণুতে ছন্দময় স্পন্দনের উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু জড় পদার্থে আর জীবিত প্রাণীতে এই তফাৎ যে, জড়-পদার্থ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তার অন্তরকে ও বাহিরকে অর্থাৎ তার মনকে এবং শরীরকে ছন্দ-শক্তি দ্বারা চালিত, সমন্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না ; কিন্তু একটি জীব তার মনকে এবং শরীরকে ছন্দ-শক্তি দ্বারা চালিত ও সমন্বিত করতে পারে। এই ছন্দ-শক্তি প্রকাশের ক্ষমতা

অন্যান্য জীবের চাইতে মানুষের বেশী। আবার বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই ছন্দ-শক্তির মাত্রার বেশী কম বিভিন্নতা আছে।

এতক্ষণ আমরা শরীর ও মনের আলাদা উল্লেখ করে এসেছি। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে এটা স্বীকার করতে হয়েছে যে, মন ও শরীরের মধ্যে কোন প্রাচীর-বিভাগ নাই। বস্তুতঃ মানুষের মনোবৃত্তি তার শরীরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এর থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, যে মানুষের তার শরীরের উপর পূর্ণ আয়ত্ততা নেই, তার মনের উপরও তার পূর্ণ আয়ত্ততালাভ হয়নি। শরীরকে ছন্দ দ্বারা পূর্ণ আয়ত্ত করতে না পারলে মনকেও পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না।

মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ তার অন্তরগত ছন্দ দ্বারাই সম্ভব —অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি জিনিষটাই ছন্দের একটা প্রকার। এই জন্য 'বিশ্বকোষ' অভিধানে 'ছন্দ' অর্থে অভিপ্রায় লেখা হয়েছে। এ থেকে আমরা এটা বুঝতে পারছি, যার ছন্দ-শক্তির অল্পতা, তার মানসিক অভিপ্রায় ও ইচ্ছাশক্তির অল্পতা। যার ছন্দশক্তি প্রবল, তার মানসিক ইচ্ছাশক্তির প্রবল। সে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা শরীর ও মন দুটোকেই স-ছন্দ ও সু-নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

ছন্দশক্তির এই রহস্য এককালে বাঙ্গালী নরনারীর সহজজ্ঞানের জিনিষ ছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই একটা সাধারণ বাংলা শব্দ থেকে—শব্দটী হচ্ছে 'ছন্ন-ছাড়া অর্থাৎ ছন্দ-ছাড়া বা ছন্দ-হীন। যে মানুষের শৃঙ্খলা নেই, চিন্তার সুসম্বন্ধতা নেই, যার কার্য্যপ্রণালী খাপছাড়া এবং যার আচরণ, চাল-চলন ও গতিভঙ্গী সুষ্ঠু ও সু-সমঞ্জস নয়, তাকেই বাঙ্গলীর নিজস্ব ভাষায় বলে ছন্ন-ছাড়া অর্থাৎ ছন্দ-হীন। সুতরাং মানুষের জীবনে ছন্দের শক্তিমত্তার ও একান্ত উপযোগিতার স্পষ্ট অনুভূতি বাঙ্গালী জাতির এক সময়ে অস্থি-মজ্জাগত ছিল। সেই বাঙ্গালী জাতির আজকাল এত অধঃপতন হয়েছে যে, তার শতকরা নিরানব্বই জন বা তারও বেশী তথাকথিত

শিক্ষিত লোক জীবনে ছন্দ আনবার কথা বললে, সেটাকে বাতুলতা বলে বিদ্রূপ করে। এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির মনে আবার ছন্দশক্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও শক্তিমত্তার উপলব্ধি আমাদের ফিরিয়ে আনবার সাধনা করতে হবে, যাতে করে আবার আমরা তার শরীর-মনের ছন্ন-ছাড়া ভাব দূর করে তাকে আবার স-ছন্দ ও সুষ্ঠু এবং অন্তরে বাহিরে পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্ করে তুলতে পারি।

পূর্ব্বোক্ত অর্থে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকে হতে হবে স-ছন্দ অথবা স্বচ্ছন্দ ; তা হলেই মানুষ তার 'স্ব-ভাব'এর সন্ধান পাবে, তা হলেই সে মানুষ-হিসাবে 'স্ব-স্থ' হতে সমর্থ হবে, অর্থাৎ শরীরও মনের 'স্বাস্থ্য' লাভ করতে পারবে।

সকল মানুষের জীবনের এই যে মূলীভূত ছন্দের কথা বলা হল, এটা হল সর্ব্বেভৌমিক ছন্দ ; কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জীবনে দুটো দিক্ আছে, একটা সার্ব্বভৌমিক দিক্, আর একটা স্ব-ভূমির দিক। সার্ব্বভৌমিক ছন্দের মূলীভূত ঐক্যের প্রকাশ হয় বিভিন্ন ভূমির বৈচিত্রময় বিভিন্ন ছন্দের মধ্য দিয়ে। সুতরাং কোন মানুষ কেবল সার্ব্বভৌমিক ছন্দ দ্বারা জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। পূর্ণতা লাভের জন্য তার প্রয়োজন তার স্ব-ভূমির ছন্দ-ধারার সঙ্গে তার জীবনকে সমন্বিত করা এবং সেই ছন্দ-ধারার অধিক্রমে জীবনকে চালিত করা। এইটেই হচ্ছে প্রকৃত জাতীয়তা এবং সত্যকার বিশ্বমানবতা—অর্থাৎ বিশ্বমানবতার পূর্ণ ছন্দকে জীবনে প্রকাশ করতে হলে স্ব-ভূমির বিশিষ্ট ছন্দকে জীবনে সঞ্চারিত করতে হবে। স্ব-ভূমির বিশিষ্ট ছন্দধারাকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের সার্ব্বভৌমিক ধারা অবলম্বন করবার চেষ্টা কখনও সফল হতে পারবে না। এটা নিখিল সৃষ্টির একটি মূলীভূত সত্য—অর্থাৎ স্থানীয় বৈচিত্র্যকে অতিক্রম ও অস্বীকার করে নিখিল ভূমার বিশাল ঐক্যকে লাভ করা অসম্ভব।

বাংলা একটি বিশিষ্ট ভূমি। এই ভূমির জলে স্থলে আকাশে বাতাসে একটি বিশিষ্ট ছন্দধারা আবহমান কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সেই ছন্দধারা এখানে একটি বিশিষ্ট ভাবরূপে প্রকাশ পেয়েছে ও পাচ্ছে। সেই বিশিষ্ট ধারার প্রকাশ খালি কণ্ঠের ভাষায় নয়; দেহের শক্তির বৈশিষ্ট্যময় ভাষায় অর্থাৎ একটি বৈশিষ্ট্যময় নৃত্যধারায় সেই ছন্দধারারই প্রকাশ, চিন্তার ও ভাবের একটি বৈশিষ্ট্যময় প্রবাহেও সেই ছন্দধারার প্রকাশ হচ্ছে! এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা বিভিন্ন কথায় বলি—বাংলার ভাষার ধারা, বাংলার নৃত্যের ধারা, বাংলার চরিত্রের ধারা, বাংলার ভাবধারা। এই সব ধারার যোগেতে একটা মহাধারার গঠন—সেই মহাধারাকে এক কথায় আমরা বলি 'বাংলা' বা বাঙ্গালী।

এই যে বাংলার বিশিষ্ট ছন্দধারার কথা বলা হল এটাই হচ্ছে বাংলার ও বাঙ্গালীর স্ব-ছন্দ অথবা স্বচ্ছন্দ। বাংলার এই স্ব-ছন্দধারার মধ্যে নিহিত আছে বাংলার ও বাঙ্গালীর স্ব-ভাব; সুতরাং এই স্ব-ছন্দ-ধারাগুলি কি বাঙ্গালী ছেলে, কি বাঙ্গালী মেয়ে, কি বাঙ্গালী যুবক, কি বাঙ্গালী যুবতী, কি বাঙ্গালী প্রৌঢ়, কি, বাঙ্গালী প্রৌঢ়া যখন আপনার জীবনে জাগ্রত ও প্রবাহিত করতে পারে, যখন সে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য-ধারার সঙ্গে নিজের জীবনের সংযোগ স্থাপন করতে পারে; তখনই সে হয় 'স্ব-স্থ', তখনই সে হয় 'আত্ম-স্থ', তখনই সে হয় 'প্রকৃতি-স্থ', তখনই সে হয় 'আত্ম প্রকৃতি-স্থ', তখনই সে হয় 'স্বাস্থ্যবান্,' তখনই সে হয় 'স্ব-ভাব-সম্পন্ন', তখনই সে হয় 'স্বচ্ছন্দ', তখনই সে হয় 'স্ব-অধীন', অর্থাৎ স্বাধীন, তখনই সে হয় 'বাধাশূন্য', তখনই সে হয় 'সুস্থ', তখনই সে হয় 'স্বাভাবিক', তখনও সে হয় 'সহ-জ' অর্থাৎ সহজ, তখনই সে হয় 'স্বাভিপ্রায়যুক্ত', তখনই সে হয় অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় 'স্ব তন্ত্র'। 'চলন্তিকা' অভিধানে 'স্বচ্ছন্দ' কথার মানে 'স্বাধীন', 'বাধাশূন্য,' 'অযত্নজাত' ও 'স্বাস্থ্যবান্'। আবার

'বিশ্বকোষ' অভিধানে অতিরিক্ত দু তিনটি মানে দেওয়া হয়েছে—যথা, স্ব-অভিপ্রায়যুক্ত, স্ব-তন্ত্র, স্বেচ্ছানুবর্ত্তী।

আমরা আজকাল প্রায়ই স্বাধীনতার কথা এবং মুক্তির কথা বলে থাকি। একটু তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে, যে অর্থে স্বাধীনতার কথা বলে থাকি, সেটা অতিমাত্র বাহ্য অর্থে একটা বাহ্য স্বাধীনতার কথা মাত্র। কিন্তু বাংলার ও বাঙ্গালীর সত্যিকার স্বাধীনতা লাভ করতে হলে একটি বাহ্য স্বাধীনতা লাভই তার চরম উদ্দেশ্য হলে চলবে না। বাঙ্গালী যদি জাতি হিসেবে, এবং বাংলার প্রত্যেক লোক যদি বাঙ্গালী হিসেবে, বাঙ্গালী ও বাংলার আত্মার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ভিতরের ও বাহিরের ভাবে ও ছন্দে একটা অন্য জাতির নকল স্বরূপ হয়ে যায়, তা হলে সে যদি বাহ্য স্বাধীনতাও পায়, সেই স্বাধীনতাকে বাঙ্গালীর স্ব-অধীনতা বা বাংলার স্বাধীনতা বলার কোন বিশিষ্ট কারণ থাকবে না। কারণ বাংলার স্ব-ছন্দ বা স্বচ্ছন্দ এবং স্ব-ধারা যদি বাঙ্গালী হারায়, তা, হলে বিশ্বে দান করবার মত তার অবদান কিছু থাকবে না। শুধু সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়ে যদি সে বৃদ্ধি পায়, তা হলে সে বিশ্বে বাংলার নিজস্ব দান কিছু করতে পারবে না বলে তার মূল্য কিছুই থাকবে না।

সুতরাং যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করতে হয়, যদি বাঙ্গালী জাতিকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন বা স্ব-অধীন করতে হয়, তা হলে আমাদের রক্ষা করতে হবে বাংলার আত্মার বৈশিষ্ট্যময় ধারা প্রবাহকে। এটাই হবে বাংলার আসল আত্মরক্ষা—বাংলার ও বাঙ্গালীর আসল স্বাধীনতার সফল সংগ্রাম—বাংলার ও বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার সফলসংগ্রাম—বাংলার ও বাঙ্গালীর স্ব-স্থতা রক্ষার সফল-সংগ্রাম—বাংলার ও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য রক্ষার সফল সংগ্রাম—বাংলার ও বাঙ্গালীর স্ব-ভাব রক্ষার সফল সংগ্রাম—বিশ্বমানবের ভাণ্ডারে বাংলার ও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট ধারার অবদান করবার সফল চেষ্টা।

অবশ্য বাংলার ও বাঙ্গালীর আত্মার স্ব-ছন্দ ও স্ব-ভাব-ধারা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের করতে হবে বাংলা ভূমির ও বাঙ্গালীর বাহ্য ও ব্যবহারিক এবং আর্থিক সম্পত্তির রক্ষা ও সংবৃদ্ধির চেষ্টা কিন্তু যে কথাটা এখানে আমি পরিস্ফুট করে বলতে চাই, সে কথাটা হচ্ছে যে এই বাহ্য স্বাধীনতার জন্যে আপ্রাণ সংঘবদ্ধ চেষ্টা নানা দিক দিয়ে করা চাই বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী দরকার বাংলার আত্মার, স্বচ্ছন্দের ও স্বভাবের আবহমান ধারার সঙ্গে যোগ স্থাপন করা, তাকে রক্ষা করা সংবৃদ্ধি করা। বাঙ্গালীর শরীরের পুষ্টির সঙ্গে তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন—বাঙ্গালীর স্ব-ভাবের ও স্ব-ছন্দের বৈশিষ্ট্যের ধারার রক্ষা ও পুষ্টি করা বাহ্য ও আন্তর এ দু'দিক দিয়ে সমান চেষ্টা করবার জন্যই আমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে অক্লান্তভাবে কৃত্য-সাধনা করতে হবে, তা হলেই আমরা বাংলাভূমিকে আবার 'সোনার বাংলা'য় পরিণত করতে পারব। বাংলা ভূমির অবদান তাহলে বিশ্বমানবের ভাণ্ডারে সোনার চেয়েও শতগুণে বেশী মূল্যবান বলে গণ্য হবে। আর তা না হলে অর্থাৎ আমরা যদি খালি বাহিরের স্বাধীনতা খুঁজি, তা হলে বাংলা ভূমির ও বাঙ্গালীর মূল্য সোনার মূল্য হওয়াত দূরের কথা, কাচের মূল্যের চেয়েও লঘু হয়ে পড়বে।

ব্রতচারী চায় বাংলার ও প্রত্যেক বাঙ্গালীর অন্তরকে তার স্ব-ভাবে ও স্ব-ছন্দে পরিপূর্ণ ও অনুপ্রাণিত করে দিতে; বাংলার ও বাঙ্গালী জাতির আবহমান ছন্দ ও ভাবধারার সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন করে দিতে; ব্রতচারী চায় যে বাঙ্গালী অন্তরের ভিতরে 'স্ব' বিষয়ে অন্য জাতির অনুকরণ করা ছেড়ে দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য-ধারাকে যেন চেনে ও তার ছন্দের সাধনা যেন করে। এক কথায়, ব্রতচারী চায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর মধ্যে একটা বাংলা-বোধ জাগিয়ে দিতে, আর তার সামনে ধরে দিতে এমন একটা পরিপূর্ণ আদর্শ—যাতে একদিকে আছে বিশ্বমানবের জীবনের পূর্ণ আদর্শ—আর এক-

দিকে আছে বাংলার মানুষের পূর্ণ-বৈশিষ্ট্যময় আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্য-ময় ছন্দধারা। ব্রতচারী চায় প্রত্যেক বাঙ্গালীকে করতে—পূর্ণ বাঙ্গালী ও পূর্ণ মানুষ; তার ভিতর জাগিয়ে দিতে—বাংলার স্বভাব ধারা-প্রবাহের গৌরববোধ; তাকে বোঝাতে চায় যে বাংলার স্ব-ছন্দ বা স্ব-ভাবের ধারাকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ পূর্ণ-বাঙ্গালী না হয়ে, পূর্ণ-মানুষ হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব; তাকে বোঝাতে চায় যে বিশ্বের সামনে বাঙ্গালীর একটা গৌরবময় অবদান আছে, সেটা বিশ্বকে দেবার জন্যে তাকে একান্তভাবে অক্লান্তভাবে প্রস্তুত হতে হবে ও সাধনা করতে হবে—তাকে বিশ্বাস করতে হবে বাংলার ও বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্যময় ছন্দ ও ভাবধারার অস্তিত্বে ও গরিমায়; এবং সেই গরিমার ভাবধারা ও ছন্দধারার সঙ্গে পরিচিত হতে তাকে করতে হবে আজীবন চেষ্টা।

কয়েকদিন আগে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাংলার খ্যাতনামা এক বংশের একটি জমিদারের সঙ্গে। তিনি নিজেও বিখ্যাত লোক, ধনী ও পদস্থ—অনর্গল চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন ও তাতে গৌরব বোধ করেন। দশটি কথা বলতে গেলে তার মধ্যে দুতিনটি কথা বাংলা বলে বাকি সাত আটটি ইংরেজী বলতে পারলে গৌরববোধ করেন। আমি যখন বললাম বাংলার বিশিষ্ট ছন্দ-ধারার কথা—চরিত্র ধারার, ভাবধারার কথা—বিশ্বমানবের সামনে বাংলার একটি বিশিষ্ট অবদানের কথা, তিনি তখন আমাকে নিতান্ত পাগল মনে করে বিদ্রূপের উচ্চহাস্য করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টা তর্ক হল—তিনি বললেন বাংলার আবার একটা বৈশিষ্ট্য কি? বাংলার ও বাঙ্গালীর কোন বৈশিষ্ট্য তিনি দেখতে পাননা—বলেন তা কখনও ছিল না, আজিও নাই। তিনি বলেন—আমি এই যে এক ধূয়া তুলেছি বাংলার ভাবধারার ও ছন্দধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে, এতে বাংলাদেশ পিছিয়ে যাবে, আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে পারবে না। এখন

এ সব সাম্প্রদায়িকতা ছেড়ে দিয়ে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করে তাদের মত হতে হবে ; তাদের ভাব, তাদের বুলি, আচার, আচরণ, আদবকায়দা আমাদের অস্থি-মজ্জাগত করতে হবে ; তাতে হয়ত আমরা একটা বড় জাত হতে পারি, নতুবা অসম্ভব।

আমার এই জমিদার বন্ধুটি বাংলার আধুনিক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের প্রতীক মাত্র। শতসহস্র বাঙ্গালী আজকাল তাঁরই মত ভাব ও চিন্তা পোষন করে। সিনেমাতে, রেডিওতে, রাস্তায় ঘাটে, দেশে বিদেশে সেখানে যা কিছু আধুনিকতার আভাষ পায় সে গুলির অনুকরণ করে বাংলার ও বাঙ্গালীর অন্তর ও স্বভাবকে আধুনিক করবার জন্য তারা ব্যস্ত। আজকালকার বেশীর ভাগ এই ধরণের বাঙ্গালী শিক্ষিত স্ত্রীপুরুষের নিকট বাংলার বিশিষ্ট ভাবধারার ও ছন্দধারার প্রসঙ্গ একটা বর্ব্বরতা ও বাতুলতার প্রকাশ বই আর কিছুই নয়। বাংলার ও ভারতের বাহ্যিক স্বাধীনতার ধূয়ায় বাংলার ও ভারতের আত্মগত ছ-ছন্দ, স্ব-ভাবধারার কোন খোঁজ স্বপ্নেও বা ভুলেও এঁরা রাখেন না বা রাখা প্রয়োজন মনে করেন না ; পরন্তু এসব একটা অসভ্যতার নিদর্শন বলে মনে করেন।

সুতরাং আমাদের এখন বুঝতে হবে, বাংলার ও ভারতের জীবন-মন একটা ভয়াবহ সন্ধিস্থলে এসে পৌছেছে, যেখানে সে তার আত্মাকে হারাতে বসেছে। আমাদের বুঝতে হবে যে আত্মাকে হারিয়ে বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্য লাভ করাতেও নিছক ব্যর্থতা ছাড়া বিন্দুমাত্র সার্থকতা নেই। সুতরাং এখন প্রয়োজন সেই সাধনার— যে সাধনা দ্বারা আমরা বাংলার স্ব-রূপকে পারব চিনতে এবং বাঙ্গালীর আত্মাকে করতে পারব আত্মস্থ, স্ব-ছন্দসম্পন্ন—তার স্বভাবকে করতে পারব তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গরিমাময়, যাতে করে সমগ্র জগতের সামনে বাঙ্গালীকে আদর্শ-জাতি করে তুলে, ভারতের ও বাংলার সংকৃষ্টিধারাকে বিশ্বময় প্রচার করে পাশ্চাত্য জগতের বর্তমান অন্তঃসারহীন, ঐক্যহীন ও অধ্যাত্ম-আদর্শহীন

জীবনকে পুনরায় জ্ঞান শ্রম সত্য ঐক্য ও আনন্দময় আদর্শের পথে পরিচালিত করতে পারব।

প্রত্যেক বাঙ্গালীর সামনে এই ব্রতের আদর্শ ব্রতচারী চায় ধরে দিতে। এই ব্রত পালন করতে হলে আমাদের প্রত্যেককে সোনার বাংলার বৈশিষ্ট্য ধারাকে খুঁজে তাকে আপন আপন জীবনে আবার প্রবাহিত করতে হবে; বুক ফুলিয়ে আবার পূর্ণ বাঙ্গালী হতে হবে এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীকে সেই পূর্ণ আদর্শের পথে চালিত করবার জন্য সাহায্য করতে হবে; বাঙ্গালী বলে' আমাদের নিজেকে অনুভব করতে হবে। বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালীর পরস্পর অভিভাষণে সোনার বাংলার জয়-যাত্রার এই অনুপ্রাণনাময় অনুভূতি আমাদের প্রতিনিয়ত অন্তরে জাগ্রত করে রাখতে হবে। বাঙ্গালী নরনারীর সঙ্গে বাঙ্গালীর দেখা হলে বুক ফুলিয়ে সগর্ব্বে উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে—অভিভাষণ করতে হবে—জয় সোনার বাংলার—'জ—সো—বা'!

শাশ্বত বাংলা-ভূমি ও শাশ্বত বাঙ্গালী

প্রত্যেক মানুষ তার জীবনকে সফলতার দিকে চালিত করতে চায়। কিন্তু সেই সফলতা লাভ করবার জন্য যে মানুষ উৎসুক, সে যদি তার নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, তা হলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, তার সফলতা যে কি প্রকারের হবে সে সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। বর্ত্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমরা দেখছি যে মানুষ কোন দেশেই তার জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পাচ্ছে না ; এবং তাতে করেই মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত ভাবে এবং জাতিগত ভাবে অনৈক্য, কলহ এবং সংগ্রামের উদ্ভব হয়ে বর্ত্তমান সভ্যতাকে এবং বর্ত্তমান জগতের মানুষকে ধ্বংসের পথে দ্রুত চালিত করছে। কেউ কেউ বলেন যে এর একমাত্র প্রতীকার হচ্ছে মানুষকে বিশ্বমানবতার শিক্ষা দেওয়া ; অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের মানুষ তার ন্যাশনেলিজম্ (nationalism) অর্থাৎ স্বদেশ-প্রেমের সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে দিয়ে একেবারে বিশ্বমানব-প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠলেই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হবে, নতুবা নয়। স্বদেশ-প্রেমের যথার্থ আদর্শ ভুলে গিয়ে এঁরা মনে করেন যে স্বদেশ-প্রেম মানুষকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে—তার মনকে বিশ্বপ্রেমে প্লাবিত হতে দেয় না। সুতরাং স্বদেশ-প্রেম যদি প্রত্যেক মানুষের মন থেকে একেবারে দূর করে দেওয়া হয় তবে তার মন প্রশস্ত হয়ে সার্ব্বভৌমিক প্রেমে ভরে উঠবে এবং সমস্ত পৃথিবীতে তা হলে শান্তি বিরাজ করবে।

এটা ঠিক যে আজকাল ন্যাশনেলিজম্ (nationalism) অর্থাৎ স্বদেশ-প্রেমের নামে অনেক দেশেই মানুষের মনে সঙ্কীর্ণতা, অন্য দেশের মানবের প্রতি হিংসা এবং অন্য দেশকে গ্রাস করবার লোভ উপজাত হয়ে বর্ত্তমান জগতে অশান্তির, কলহের ও সংগ্রামের

সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এটা হয়েছে স্বদেশ-প্রেমের সত্য প্রকৃতির ধারণার অভাবে; তার সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের ও অনুভূতির অভাবে। এই দ্বন্দ্বের আর একটা কারণ, কোন কোন দেশের মানুষ মনে করে যে তাদের দেশের সংকৃষ্টি অন্যান্য দেশের সংকৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই অন্য-দেশ-ঘৃণামূলক মনোবৃত্তির ফলে এক দেশের লোক চায় অন্য দেশের সভ্যতা ও সংকৃষ্টির উপর নিজের দেশের আধিপত্য বিস্তার করতে। এটা হয়েছে বর্ত্তমান যুগে মানুষের মনে অধ্যাত্ম আদর্শের অভাব এবং বস্তু-তান্ত্রিক আদর্শের প্রাবল্যের ফলে। এতে করেই বর্ত্তমান জগতে অশান্তি ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রতচারী আদর্শ যে সকল মূলীভূত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত,—একমাত্র তাতে করেই বর্তমান জগতের উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব। এই সংচেষ্টায় আছে বস্তু-তন্ত্রের চেয়ে অধ্যাত্ম আদর্শের শ্রেষ্ঠতার প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ এবং জীবনে ভোগ-তান্ত্রিক আদর্শকে দূর করে জ্ঞান-শ্রম-সত্য-ঐক্য-আনন্দ-মূলক অধ্যাত্ম আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার উপায় নির্দ্ধারণ। এটা হল মানুষের জীবনের লক্ষ্যের দিক থেকে ব্রতচারী সংচেষ্টার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ব্রতচারী সংচেষ্টার যে অন্য দিক, তাতে আছে স্বদেশ-প্রেমের সত্য প্রকৃতির নির্দ্দেশ এবং সত্যিকার স্বদেশ-প্রেমের উপর প্রত্যেক দেশের মানুষের অন্তর্দৃষ্টি আকর্ষণ—প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবন সমগ্রভাবে সংগঠিত করবার সত্য-নির্দ্দেশ প্রদান।

স্বদেশ-প্রেমকে ব্রতচারী এক নূতন সংজ্ঞার উপর স্থাপিত করতে চায়, যাতে করে এক দেশের মানুষের মনে অন্য দেশের মানুষের প্রতি হিংসা বা দ্বেষের ভাব নির্ব্বাসন করে তার স্থানে এনে দেয়—পরস্পর শ্রদ্ধার, অনুরাগের, সহযোগিতার এবং সমন্বয়-স্থাপনের আগ্রহ। ব্রতচারী সংচেষ্টার এই নূতন স্বদেশ-প্রেমের সংজ্ঞার মূলে আছে ছন্দবাদ এবং ভূমিবাদ। প্রত্যেক

প্রাকৃতির দেশ একটা বিশিষ্ট ভূমি। সেই ভূমির আকাশে বাতাসে জলে স্থলে নদীতে প্রান্তরে একটি বিশিষ্ট ছন্দ-স্রোতের ধারা প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়ে সেই দেশের মানুষকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করে; তাদের চরিত্রে—তাদের ভাষায়—তাদের সাহিত্যে—তাদের কণ্ঠের সুরে—তাদের গতি-ভঙ্গীতে—তাদের নৃত্যে ও গীতে একটা বৈশিষ্ট্যময় ভাব দান করে। জগতের প্রত্যেক বিশিষ্ট দেশে বা ভূমিতে এইরূপ একটী বিশিষ্ট ছন্দধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই ভূমিবাদ ও ছন্দবাদের সত্যকে মানুষ বর্ত্তমান জগতে অস্বীকার এবং উপেক্ষা করছে বলেই আজ প্রত্যেক দেশের মানুষের মন তাদের সত্য-প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার ফলে তাদের অন্তরের অন্তস্তলে একটা গভীর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে করে আজকাল বিশ্বমানবের জীবন প্রতিদেশেই দ্বন্দ্বময় কলহময় ও অশান্তিময় হয়ে পড়েছে। যতদিন না প্রত্যেক দেশের মানুষ সেই দেশের ভূমির সত্য-প্রকৃতির উপলব্ধি করতে পারবে এবং সেই ভূমির ছন্দধারার সঙ্গে নিজের জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ-স্থাপন করে সেই ভূমির ছন্দের পূর্ণ প্রকাশ-স্বরূপ হয়ে উঠতে পারবে, ততদিন মানুষের জীবন ছন্ন-ছাড়া, কৃত্রিম, অস্বাভাবিক ও অপূর্ণ থেকে যাবে—ততদিন বিশ্বে এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের দ্বন্দ্ব কলহ বিরাজ করবে। কিন্তু প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবনে নিজস্ব ছন্দধারার সংযোগ স্থাপন করতে পারলে একদিকে আমরা পারব প্রত্যেক মানুষের জীবনে স্বভূমির প্রতি গভীর প্রেম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশের ছন্দধারার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধ জাগাতে; এবং তার ফলে অন্য ভূমির মানুষের প্রতি ঐক্যের ও প্রেমের ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

ব্রতচারী-আদর্শ বিশ্ব-মানবের মনে প্রত্যেক ভূমির প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এনে মানুষের জীবনকে সকল দেশে

পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে দিতে পারবে, এর ইঙ্গিত পাশ্চাত্য দেশের মনীষীরা এর মধ্যেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন ও স্বীকার করেছেন। বিশেষ করে স্বীকার করেছেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী ও কবি লরেন্স বিনিয়ন (Laurence Binyon)। তিনি বলেছেন—"বর্ত্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করে পশ্চিম দেশে, আমরা জীবনের সমগ্রতাটিকে যেন হারিয়ে ফেলেছি—আমরা জীবন-ধারার সত্য রূপকে যেন হারিয়ে ফেলেছি ; ব্রতচারী সংচেষ্টা জীবনের এই সমগ্রতা ও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই লুপ্ত সংযোগ পুনঃস্থাপন করিয়ে দেওয়ার একটী পন্থা।"*

ব্রতচারী সংচেষ্টা প্রত্যেক দেশের মানুষের সঙ্গে তার ভূমির সংযোগ করে দিতে চায়। এটা প্রাদেশিকতা নয়—এটা সঙ্কীর্ণ স্বাদশ-প্রেম নয়—এটা মানুষের উৎপত্তির গভীরতম বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে সত্যটি সম্বন্ধে আজকালকার সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই, আজকালকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ্গণও অজ্ঞ।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি—প্রতি দেশের মানুষ চায় নিজের জীবনে পূর্ণ সফলতা আনতে—কিন্তু তা করতে গেলে তাকে নিজের জীবনে আনতে হবে আত্মপরিচয়। "আত্মানং বিদ্ধি"—এটা শুধু সংস্কৃতে বলে না ; সব ধর্ম্মের মূলে "know thyself" (নিজের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন কর) এই আদেশ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে পারছে না,—

* "It seems to me that all over the world—of course we feel it more in the West with all our technical advance—we have lost sight somehow of life as a whole. We have lost somehow the art of living. As far as I understand the various movements Mr. Dutt has started—the Bratachari Movement and others, they have for their aim to recover this sense of the wholeness of life and the lost harmony of man with nature,"

—INDIAN ART AND LETTERS, Vol, X, No. 1, 1936—pp. 33.

তা হয়েছে তার জন্মভূমির সঙ্গে, তার মাতৃভূমির সঙ্গে তার দেহ-মনের উৎপত্তির যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান জগতে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলে। প্রাচীন ভারতে এ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যের স্পষ্ট অনুভূতি যে ছিল, এটা আমরা কয়েকটী কথায় সহজে বুঝিয়ে দেব। প্রথম কথাটা হচ্ছে 'ভূমিজ' শব্দ। যে কোন ভাল অভিধান খুলে দেখুন, 'ভূমিজ' শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে 'মানুষ'। অর্থাৎ মানুষ তার ভূমি হতে উৎপন্ন, এটা একটা কেবল ভাবপ্রবণতার কথা নয়, শুধু ভাবপ্রবণতার বশে ভূমিকে 'মা' ডাকা হয় না। দেশে দেশে নিজ ভূমি হতে মানুষের দেহ মন তৈরী হয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "matrix" ; যে যে মৌলিক পদার্থ থেকে কোন জিনিষ উৎপন্ন বা তৈরী হয়—তাকে বলে matrix. অর্থাৎ যেমন যে মাটি থেকে কুম্ভকার তার কুম্ভ তৈরী করে সেই মাটিটা হয় কুম্ভের matrix. এই matrix-এর ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে 'মাতৃক' অর্থাৎ যে পদার্থ থেকে কোন জিনিষের উদ্ভব বা তৈরী হয় সেই পদার্থই হচ্ছে সেই উৎপন্ন জিনিষের মাতৃক। এটা আমার একটা মনগড়া কথা নয় ; সংস্কৃত অভিধান খুলে দেখলে, দেখতে পাওয়া যাবে যে 'মাতৃক' শব্দের অর্থ উৎপত্তি-ভূমি অর্থাৎ উৎপত্তিদায়ক পদার্থ। সুতরাং এই অর্থে প্রত্যেক মানুষের জননী তার মাতৃক। কিন্তু কেবল মাত্র জননী যে তার মাতৃক, তা নয় ; তার জন্মভূমিও যে তার মাতৃক এ কথার আভাষ আমরা পূর্ব্বে পেয়েছি "ভূমিজ" কথা থেকে। সেই জন্যই আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ঘোষণা করে গেছেন—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ; কেননা জননী ও জন্মভূমি উভয়েই আমাদের মাতৃক বা উৎপত্তি-ভূমি ; তাদের অংশ নিয়েই আমাদের দেহ মন তৈরী। তাদের অন্তর্নিহিত ছন্দধারায় আমাদের দেহ মন অনুছন্দিত ও নির্মিত। শুধু হিন্দু ধর্ম্মেই এই সত্যের উপলব্ধি হয়েছিল তা নয়, ইস্‌লাম ধর্ম্মেও একথাটার স্পষ্ট আভাষ আমরা পাই—হদিসের বিখ্যাত কথায়—"হুব্‌বুল ওতন্‌

মিন্ অল ঈমান্" অর্থাৎ ধর্ম্মের একটি অঙ্গ হচ্ছে স্বভূমির প্রতি প্রেম। সুতরাং এতে করে আমরা পাচ্ছি যে, মানুষ যদি নিজের সত্য-প্রকৃতিকে জানতে চায় তাহলে সে যে মাতৃভূমি বা মাতৃক হতে উৎপন্ন, তার সত্যরূপ সর্ব্বপ্রথমে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। সেই মাতৃক হতে উৎপত্তিকে তার ধর্ম্মের একটা অঙ্গ করে পবিত্র সত্যরূপে গ্রহণ করতে হবে।

এতে করে আমরা আরো পাচ্ছি যে, নিজেকে প্রকৃত সত্যভাবে চিনতে হলে প্রথমে চিনতে হবে নিজের ভূমির সত্য-প্রকৃতিকে। বাঙ্গালী যদি নিজেকে প্রকৃতভাবে চিন্‌তে চায়, নিজের প্রকৃতিকে যদি চিনতে চায়, তা হলে তাকে প্রথম চিনতে হবে বাংলা-ভূমিকে, বাংলা-ভূমির প্রকৃতিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী বর্ত্তমান যুগে বাংলা-ভূমির সত্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমার বিশ্বাস যে একবার বাংলা-ভূমির সত্য-প্রকৃতিকে চিন্‌তে পারলে আমরা বাঙ্গালীর অন্তরের মধ্যে সেই ভূমির প্রতি এমন একটা প্রগাঢ় গৌরব এবং মমত্ব এনে দিতে পারব যাতে করে সেই গৌরবের মহিমায় ও সেই মমত্বের প্লাবনে সব বাঙ্গালী একপ্রাণ একমন হয়ে গিয়ে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভিন্নতা ভুলে যাবে এবং অভিনব এক সখ্যে সম্মিলিত হবে। বাংলা-ভূমির প্রকৃতির সেই সত্য-রূপকে চিনিয়ে দেবার চেষ্টা আজ আমরা করব।

বাংলাভূমি বিশাল ভারত ভূমির একটি অঙ্গ। এই বিশাল ভারত ভূমিতে একটি ঐক্যের গভীর ছন্দধারা আবহমান কাল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু সেই ছন্দধারার কেন্দ্র কোথায় তার অনুভূতি বোধ হয় আমাদের অনেকেরই নেই। সেই ঐক্যধারার গঠন কেবলমাত্র যে একদিকে উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং অন্যদিকে সাগর-বেষ্ঠন দ্বারা হয়েছে তা নয়। আমার মনে হয়, সেই ঐক্যধারার কেন্দ্র হিমালয়ের সুদূর উত্তর দেশে কৈলাস পর্বতের সান্নিধ্যে মানস-সরোবরের অন্তরতম তলদেশে।

এই মানস সরোবর থেকে একদিকে বেরিয়েছে শতদ্রু নদী এবং তার উত্তর দিক থেকে বেরিয়েছে সিন্ধু নদী। এদের ধারায় তৈরী হয়েছে পঞ্চনদ দেশ। অপরদিকে এই মানস সরোবর থেকে বেরিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের সুদূরপ্রবাহিনী ধারা এবং তার দক্ষিণে গঙ্গোত্রী হতে বেরিয়েছে গঙ্গানদীর আর্য্যাবর্ত্ত-পরিব্যাপ্ত ধারা প্রবাহ। ভূমি প্রকৃতির এই যে ঐক্যের কেন্দ্র কৈলাস পর্ব্বত, গঙ্গোত্রী ও মানস সরোবরের দেশ—এটা ভারতের সংস্কৃতির ঐক্যের একটা গভীর প্রতীক।

কিন্তু ভারতভূমির কথা ছেড়ে দিয়ে বাংলা-ভূমির সত্য-প্রকৃতির কথা যদি ভেবে দেখি, তাহলে সমগ্র ভারতের ও সমস্ত জগতের মধ্যে বাংলাভূমি সত্য সত্যই যে কি অতুলনীয় ভূমি, তা আমরা বুঝতে পারব। বাংলাভূমির সত্য-প্রকৃতির রূপের এই অনুভূতি একটি জাগ্রত স্বপ্নের মত আমার মানস-চক্ষে আবির্ভূত হয়ে তার অতুল সৌন্দর্য্য, গরিমায় ও মহিমায় আমার মনকে ভরপূর করে তুলেছে। বাংলাভূমির সত্য-প্রকৃতির সেই ছবি আমি প্রত্যেক বাঙ্গালী নরনারীর, প্রত্যেক বাঙ্গালী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার, প্রত্যেক বাঙ্গালী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার, প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবক-যুবতীর, প্রত্যেক বাঙ্গালী শিশুর মনশ্চক্ষের সামনে এঁকে দিতে চাই, প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রাণের অন্তস্থলে তাকে স্থাপিত করতে চাই; তাহলে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বাংলার ভূমি যে কত গৌরবময় উপাদান দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে—আমাদের মাতৃভূমির ও "মাতৃকের" প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যে কত অতুলনীয় তা উপলব্ধি করতে আমরা পারব এবং তাহলে আমরা বাংলার স্ব-ছন্দ-ধারার প্রবাহ আমাদের জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আকুল আগ্রহবান হব।

বাংলাভূমির যে ছবি আমরা সাধারণতঃ আঁকি, যে মানচিত্র স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়েদের শেখান হয়—সেটা একটা অতি সঙ্কীর্ণ, অতি অসম্পুর্ণ, অতিমাত্র আংশিক খণ্ড-বিখণ্ডিত

বাংলা। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সুবিধা অসুবিধার হিসাব-ব্যবস্থায় বাংলাভূমির যে বাঁটোয়ারা হয়েছে, তার সঙ্গে বাংলার ভূমিগত ও প্রকৃতিগত সত্তার সম্পূর্ণ অমিল হয়েছে। যে বাংলাভূমির কথা আমরা আজকাল স্কুলে বইতে পড়ি তা এই রাষ্ট্রীয় বাঁটোয়ারা-প্রসূত বিখণ্ডিত এবং আংশিক একটা ভূমিখণ্ড মাত্র। কিন্তু বাংলাভূমির ছন্দগত এবং প্রকৃতিগত একটা নিজস্ব সত্তা আছে, যেটা বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দঃ-প্রসূত, যেটা শাশ্বতভাবে রাষ্ট্রীয় বাঁটোয়ারার ভাগাভাগির বহু উর্দ্ধে এবং এই ভাগাভাগি যাকে বিনষ্ট করতে পারে না এবং পারবে না। সেই বিশ্বপ্রাকৃতিক বাংলাভূমিকে আমাদের চিন্‌তে হবে। সেই বিশ্বপ্রাকৃতিক বাংলার একটি সহজ সংজ্ঞা-স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, যে ভূমির ছন্দে ছন্দে তার অধিবাসীর অন্তরে বাংলা ছন্দ তৈরী হয়, কণ্ঠে বাংলা ভাষা নির্গত হয়—সেই ভূমিই বাংলা-ভূমি। এই অর্থে এখন বাংলার বাইরে অনেক জেলা আছে যেগুলি এই বিশ্বপ্রকৃতিগত সত্য বাংলা ভূমির অবিচ্ছিন্ন অংশ; যথা পূর্ণিয়া জেলা, মানভূম জেলা, সিংভূম, হাজারিবাগ, রাঁচি ইত্যাদি ছোটনাগপুরের প্রদেশ; এবং পূর্বদিকে কাছাড়, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাংলাভাষী প্রদেশ। এই প্রাকৃতিক বাংলাভূমির সমগ্র সত্তাকে রাষ্ট্রীয় খণ্ড-বিখণ্ডের মধ্যেও আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ রাখতে হবে এবং সেই বৃহৎ বঙ্গভূমির ছন্দধারাকে এই সমগ্র ভূমির মানুষের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত করে বিশ্বে তার অতুলনীয় অবদান প্রদান করবার জন্য সাধনা করতে হবে। এতে করে হবে বিশ্বে বাঙ্গালীর সার্থকতা ও মূল্য। কিন্তু এই যে বাংলাভাষা-নির্ম্মাত্রী প্রকৃতি, যেটি আমাদের দেহ-মনের "মাতৃক", এই যে আমাদের সোনার বাংলাভূমি, এর প্রকৃতি এবং এর ছন্দ-ধারার গরিমা এবং মহিমা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে আমাদের খুঁজতে হবে তার শক্তির উৎপত্তির উৎস-ধারা-গুলিকে। বিশ্বপ্রকৃতির বিধানে যে সব উৎস-ধারার স্রোতে এই

সোনার বাংলাভূমি অনুপ্রাণিত ও অনুছন্দিত, সেই উৎস-ধারাগুলির সন্ধান নিয়ে বাংলা ভূমির পূর্ণ রূপকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সেই সন্ধান নিতে গেলে আমরা কি পাই? পাই এক অনুপম অনির্ব্বচনীয় রূপ, যা সমগ্র জগতের মধ্যে অতুলনীয়। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির উচ্চতম উৎস-ধারার সংযোগে, সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠতম ধারাপ্রবাহের সাধনায়, আমাদের এই সোনার বাংলা-ভূমির সৃষ্টি হয়েছে, এই বাস্তব সত্য, এটা প্রাকৃতিক সত্য।

সুদূর মানস সরোবর থেকে উদ্ভূত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের ধারা এসেছে বাংলাকে গঠিত, অনুছন্দিত ও অনুপ্রাণিত করবার জন্যে—তার জন্যে তার ধারা এসেছে হিমালয়ের সুদৃঢ় প্রাচীরকে ভেঙ্গে অপ্রতিহত বেগের আবেগে। এই দেশকে অনুছন্দিত করবার জন্য ছুটেছে—গঙ্গা, সুদূর গঙ্গোত্রী-শিখর থেকে—বদরীনাথের ও নন্দা দেবীর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গতল থেকে। অপর দিকে, একদিকে গঙ্গার ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে বর্দ্ধিত করেছে—হিমালয়ের শৃঙ্গদেশ থেকে নির্গত ঘর্ঘরা গণ্ডক প্রভৃতি নদী; আবার অপর দিকে এই গঙ্গা-ধারার সঙ্গে যোগ দিয়েছে হিমালয় থেকে নির্গত যমুনার ধারা এবং আরাবলী ও বিন্ধ্য পর্ব্বতরাজি থেকে নির্গত বনগঙ্গা, বানস, পার্ব্বতী, চম্বল, বেতুয়া ও শোন নদীর ধারা। এগুলি বাংলার বাহিরে বটে, কিন্তু এদের ধারা গঙ্গাধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে—বাংলাভূমিতে এসে পরিণতি লাভের জন্য চিরন্তন কাল থেকে ধাবিত হচ্ছে। তাদের ধারার সাধনার পরিণতি বাংলা-ভূমিতেই সংসাধিত হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গাধারার মহামিলনে আমাদের সোনার বাংলাভূমির গঠন, কিন্তু তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এমন আরও কয়েকটি ধারার—যেগুলি বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং যেগুলি বিশ্বপ্রকৃতি কেবল বাংলাকে গঠন করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই বিশিষ্ট ধারাগুলির উৎপত্তি হয়েছে হিমালয়ের সর্বোচ্চ সুমেরু (Everest)-শিখর, গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গদেশ

হতে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তুঙ্গ এই যে বিশাল সুমেরু (Everest) ও কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ, তাদের পাদদেশধৌত সলিল-ধারার মানচিত্র দেখলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, এগুলি তৈরী হয়েছে বাংলা ভূমির গঠনের ও অনুপ্রেরণার জন্য। পূর্ণিয়ার পশ্চিমবাহী কুশী (কৌশিকী) নদীর বহু-বিস্তৃত উৎপত্তি-ধারাগুলি এভারেষ্ট ও গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের পাদদেশ বেষ্টন করে তাদের শৃঙ্গদেশ-নির্গত তুষার-কণা থেকে নিঃসৃত প্রতি জলবিন্দুকে বাংলাদেশকে গঠন করবার জন্য বহন করে প্রধাবিত করে আসছে। তেমনি ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদী আসছে কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশ বেষ্টন করে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরের তুষারকণা হতে নিঃসৃত জলবিন্দু-ধারাগুলিকে বাংলাদেশকে গঠনের জন্য প্রধাবিত ও প্রবাহিত করে। কুশী নদী এবং তার শাখা তিলযোগা নদী যে বাংলার প্রকৃত পশ্চিম সীমান্ত, তার প্রমাণ আমরা পাই 'দ্বারভাঙ্গা' জেলার নামটী থেকে। এই দ্বারভাঙ্গা জেলাটী কুশী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত এবং ইহা "দ্বারবঙ্গ" কথারই অপভ্রংশ। এই দ্বারবঙ্গ নাম থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, এই প্রদেশই প্রাকৃতিক বাংলা-ভূমির পশ্চিম-"দ্বার"-স্বরূপ। এই দ্বারবঙ্গের পূর্ব্বসীমানা অর্থাৎ কুশী নদীর ধারা থেকে বাংলাভূমির আরম্ভ। পশ্চিম দিকে বিন্ধ্য-পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে ও মন্দার পর্ব্বতের তলদেশ হতে সুবর্ণরেখা, রূপনারায়ণ, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি স্রোতস্বতী প্রধাবিত হয়েছে পশ্চিম-বাংলাকে গঠন করতে। আর পূর্ব্বদিকে সুরমা, কুশিয়ারা, বরাক, মেঘনা, ফেণী ও কর্ণফুলী, জয়ন্তী পর্ব্বত ও রাঙ্গামাটীর পর্ব্বতরাজি থেকে নির্গত হয়ে বাংলা-ভূমির কাছাড়, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশকে গঠন করার জন্য প্রবাহিত হয়ে আসছে। নদীমাতৃক আমাদের এই সোনার বাংলাভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনা অন্য কোন দেশে নেই। বাংলাভূমির সত্যিকার প্রাকৃতিক মানচিত্র দেখলে সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।* বহু নদীর তরঙ্গছন্দে অনুছন্দিত এই বাংলাভূমি-প্রসূত যে মানুষ, তার জীবনের অন্তস্তলে যে একটা অতুলনীয় ছন্দধারা প্রবাহিত হবে, সেতো আশ্চর্যের কথা নয়; এবং তার বাস্তব প্রমাণ আমরা পাই বাংলার ইতিহাসে, বাংলার সত্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে, তাদের ছন্দশক্তির অতুলনীয় প্রতিভায়, তাদের অধ্যাত্ম-শক্তির মহিমায়। চৈতন্য, জয়দেব, চণ্ডীদাস, কবি দৌলতকাজী, আলাওল, শাহজলাল, রামমোহন রায়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মহিমময় ছন্দ-প্রতিভা ও অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ একমাত্র এই নদীমাতৃক বাংলা ভূমিতেই সম্ভব।

বাঙ্গালী যদি তার স্ব-ভূমির এই প্রকৃত রূপের সন্ধান অন্তরে আনতে না পারে, তার স্বরূপ মানসচক্ষে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করতে না পারে, তবে সে তার নিজের সত্যস্বরূপ ও প্রকৃতির উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হবে। ব্রতচারী চায় প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া ও বালক-বালিকাকে বাংলার এই অতুলনীয় নদীমাতৃক, ছন্দমাতৃক রূপের সন্ধান এনে দিতে, যাতে করে সে তার এই মাতৃভূমির, তার প্রাকৃতিক মাতৃকের সত্যপ্রকৃতির গৌরব বোধ করতে পারবে; এবং তার মহিমায় তার নিজের অন্তরে এমনি একটা বিশিষ্ট গৌরববোধ আনতে পারবে, যার দ্বারা বিশ্বে তার বিশিষ্ট অবদানের গৌরববোধ তার অন্তরে প্রতিনিয়ত জাগবে। সে অবদান বস্তুতান্ত্রিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠভাবে পরিস্ফুট হয় না—সে অবদান পরিস্ফুট হবে বাংলার স্ব-ভাবের, স্ব-ছন্দের ও স্ব-প্রকৃতির দানে,

---

* এ বিষয়ে "Seience and Culture" পত্রিকার ১৯৩৯ সনের অক্টোবর সংখ্যায় "A Bratachari Map of the Ganges-Brahmaputra Basin" প্রবন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি, এবং একটী বৃহৎ মানচিত্র দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

যে দান বিশ্বে অনন্তকাল তার প্রভাব জাগিয়ে রাখবে, যে দান কেবল বাঙ্গালীই দিতে পারবে, যা অন্য ভূমির লোকেদের দেওয়া অসম্ভব। সেই জন্য আমি "বাংলা-ভূমির দান" শীর্ষক গানে এই ভূমিবোধ প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়ে দেবার জন্য লিখেছি ঃ

আমরা বাঙ্গালী, সবাই বাংলা মা'র সন্তান—
বাংলা ভূমির জল ও হাওয়ায় তৈরী মোদের প্রাণ।
মোদের দেহ, মোদের ভাষা, মোদের নাচ আর গান,
বাংলা ভূমির মাটী হাওয়া জলেতে নির্মাণ।
বাংলা ভূমির প্রেমে মোদের ধর্ম্ম আর ইমান্—
বাংলা ভূমি মোদের কাছে স্বর্গসম স্থান।
বাংলা ভূমির ছন্দ-ধারার পালন করে মান—
দান্‌ব মোরা বিশ্বে মোদের বিশিষ্টতম দান।

শাশ্বত বাঙ্গালীর প্ররক্ষণ

আমাকে যদি এক কথায় ব্রতচারী সংচেষ্টার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে কেউ বলে, তা হলে আমি বলব—এর উদ্দেশ্য, ব্রতচারীর পঞ্চব্রত অর্থাৎ জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দ—এই পঞ্চবিধ পরিপূর্ণ আদর্শের একাধারে বিকাশ করে বিশ্বমানবের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতে সাহায্য করা। এই অর্থে ব্রতচারী সংচেষ্টা সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বভৌমিক। কিন্তু ব্রতচারীর বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মতে বিশ্বমানবের জীবনে চরম সার্থকতা আনা ততক্ষণ অসম্ভব, যতক্ষণ না প্রত্যেক বিভিন্ন ভূমি-জাত মানুষ তাদের আপন আপন ভূমির বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিধারার পূর্ণ বিকাশ করতে পারবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্রতচারী সংচেষ্টা একাধারে সার্ব্বভৌমিকতাবাদী ও নিবিড় জাতীয়তাবাদী। বিশ্বমানবের পরিপূর্ণতার আদর্শকে ব্রতচারী সমন্বিত করতে চায় প্রত্যেক ভূমির সংস্কৃতির ক্রমধারার সঙ্গে। ব্রতচারী চায় প্রত্যেক জাতিকে তার নিজস্ব সংকৃষ্টি-ধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দিতে।

বর্ত্তমান সময়ে বাংলাদেশের মানুষ এমন একটা যুগ-সন্ধিস্থলে এসে পড়েছে, যেখানে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ব্রতচারী-আদর্শের বাণীর বিশেষ প্রয়োজন। আজকাল আমরা যে যুগে এসে পড়েছি, তথাকথিত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক একে সসম্ভ্রমে বলেন 'অধুনাতন' অর্থাৎ 'মডার্ণ' যুগ। তাঁরা এই অর্থে বলেন, যেন এটা এমন একটা অভিনব ও উন্নত আদর্শ এনে দিচ্ছে, যা ছিল অতীত যুগের মানুষের কল্পনার একেবারে বাইরে এবং তাদের আদর্শের অনেক উচ্চে। আর কেবল তা-ই নয়, তাঁদের মতে অতীত যুগের আদর্শ থেকে যত বেশী অমিল ঘটে, আধুনিকতার ততই বেশী প্রগতি ও বাহাদুরী। এই ধারণার ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, আজকাল

পাশ্চাত্য দেশের দেখাদেখি বাংলার এবং ভারতের যুবক যুবতীরা ও শিক্ষিতেরা আপন দেশের যা কিছু প্রাচীন ধারা তাকে নেহাৎ সেকেলে ও অনাধুনিক বলে তাচ্ছিল্যের ভরে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে অতি-আধুনিক যৌন সাহিত্য থেকে এবং অতি-আধুনিক সিনেমা, রেডিও ও অন্যান্য যান্ত্রিক প্রণালীর অভিপ্রদর্শন থেকে লব্ধ নতুন নতুন কায়দার প্রবর্ত্তন করে দেশের মাটি ও দেশের ধারা ছেড়ে এক লাফে তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে ঝাঁপিয়ে একেবারে অতি নূতনত্বের পথে গিয়ে অতি আধুনিক বা 'মডার্ণ' বলে পরিচিত হবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র। তার ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মানুষ ও আপন আপন ভূমিগত সংকৃষ্টির বৈচিত্র-ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে যন্ত্রনির্ম্মিত এক-ছাঁচে গড়া কারখানার মাল হয়ে উঠছে এবং এটাকে সভ্যতার চরম পরিণতি বলে গণ্য করা হচ্ছে।

ব্রতচারী সংচেষ্টা চায়, বাঙ্গালী নরনারীকে বুঝিয়ে দিতে যে, শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যে সভ্যতার ও উন্নতির এই যে আধুনিকতার আদর্শ, ইহা মূঢ়তা-প্রসূত এবং ভ্রান্তিমূলক। এই আদর্শবাদের আমদানী মূলতঃ আমেরিকা থেকে। আমেরিকার এই আধুনিকতা-আদর্শ-রাক্ষসী প্রথমে ধীরে ধীরে ইউরোপের জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এখন ইউরোপের নানা জাতির আপন আপন বৈশিষ্ট্যমূলক বহুমূল্য যে প্রাচীন সংকৃষ্টিধারা ছিল সেগুলোকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। এটা ইউরোপের সুধীগণ আজ বুঝতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরে হাহাকার করছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই রাক্ষসী ইউরোপের সংকৃষ্টিধারাগুলো এতদূর গ্রাস করে ফেলেছে যে, এর হাত থেকে তাদের রক্ষা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ইউরোপের সুধীগণ তাই ভারতবর্ষের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছেন—ভারতবর্ষ যে অতি প্রাচীন সংকৃষ্টি-ধারাকে সনাতনকাল থেকে অতি যত্নে লালন করে আসছে, তার

সঞ্জীবনীধারা থেকে তাঁরা হয়ত নিজের নিজের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি-ধারাকে আবার সঞ্জীবিত করতে পারবেন, এই আশায়। কিন্তু সেই রাক্ষসী ইতিমধ্যেই ভীষণ-বেগে এসেছে, তার বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহ নিয়ে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিধারাকে গ্রাস করতে এবং আমরা বাংলা ও ভারতের যুবক-যুবতী ও শিক্ষিতগণ তার বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত হয়ে আমাদের সর্ব্ব'স্ব'কে—আমাদের জাতীয় জীবনের মূলীভূত বৈশিষ্ট্যময় যাবতীয় স্ব-ধারাকে বিসর্জ্জন দিয়ে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। এরকম আরো কিছুদিন চললে বাঙ্গালী ও ভারতের অন্যান্য জাত যে তাদের প্রাচীন সমগ্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে ইউরোপ আমেরিকার ছাঁচে-ঢালা একঘেয়ে কলের মানুষ হয়ে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

আমেরিকার পক্ষে এই অতি-আধুনিকতা সাজে—কারণ তার নিজস্ব ধারা কিছু ছিল না। তাই তার অন্তরের শূন্যতা ও নিঃ'স্ব'তার দৈন্য ঢাকতে গিয়ে সে এই অতি-আধুনিকতার সৃষ্টি করেছে। তার আর অন্য কোন পথ ছিল না এবং এর ফলে তার কিছু ক্ষতি হয় নি,—কারণ যন্ত্র ও যন্ত্রজাত জিনিষ ছাড়া বিশ্বে তার কোন অবদান ছিল না। অর্থাৎ জাতির অন্তরের গভীর ক্রমধারার যে কত বড় মূল্য তা আমেরিকা জানে না—তা জানবার তার কোন সুযোগ হয়নি; এবং বিশ্বের জীবনে কোন জাতির মূল্য যে কেবলমাত্র তার অন্তরের ক্রমধারার বৈশিষ্ট্যের অবদান, এটা আমেরিকার বুঝবার কখনো সুযোগ হয়নি। আমেরিকার আধুনিকতা-রাক্ষসীর মোহে যারা মুগ্ধ, তারাও বিশ্ব-সৃষ্টির মূলীভূত এই সত্যের অনুভব করতে অক্ষম। কিন্তু ভারতের মানুষ—বিশেষ করে বাংলার মানুষ—যদি এই সত্যকে আজ অনুভব করতে অক্ষম হয়, তা হলে হয়ত আমরা অচিরে আমেরিকার চেয়েও বড় যান্ত্রিক জাত হয়ে উঠতে পারি—অর্থের দিক দিয়ে ও বস্তু-সমৃদ্ধির দিক দিয়ে—কিন্তু বাংলার শাশ্বত ভূমিগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যধারা

হারিয়ে বিশ্বমানবের আসরে আমাদের দান করবার কোন কিছু থাকবে না এবং ভবিষ্যৎ যুগে যখন বিশ্বমানুষ সভ্যতার প্রকৃত অর্থ বুঝবে, তখন আমরা বর্ত্তমান মিশর ও গ্রীসের মতো স্ব-সংস্কৃষ্টিচ্যুত হয়ে নিঃস্ব ও দীনরূপে তাদের চোখে প্রতিভাত হব। একবার আমাদের জাতীয় সংস্কৃষ্টিধারার সঙ্গে যোগলুপ্ত হলে আবার তাকে জাতির জীবনে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হবে।

ব্রতচারীর মূলতত্ত্ব ভূমিবাদ ও ছন্দবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ব্রতচারী বিশ্বাস করে, বাংলার স্ব-ধারার একটা শাশ্বত রূপ আছে। একটা নদী যেমন পর্ব্বত-শৃঙ্গ হতে ক্ষীণধারায় উৎপত্তিলাভ করে' শাখা-প্রশাখার দ্বারা ক্রম-বর্দ্ধিত হয়ে তার নিজের প্রবাহের একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে' তার নিজস্ব একটা পথ খনন করে' অনন্ত সাগরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চিরধাবিত হয়, ব্রতচারীর মতে প্রত্যেক ভূমিজাত জাতির জীবনধারা এরই অনুরূপ একটি ক্রম-প্রবাহিত সংস্থিতি-ধারা। কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে নদীপ্রবাহে যে বিশিষ্ট জলবিন্দুগুলি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের সেই নদীর সত্তায় চির-স্থায়িত্ব নেই; তারা চলে যাচ্ছে সমুদ্রে। কিন্তু তাদের জায়গায় অনন্তকাল অন্যান্য জলবিন্দু এসে সেই ধারার সংস্থিতিকে অব্যাহত রাখছে, সেই সংস্থিতিকে অব্যাহত রাখাই নদীর প্রবাহের জলবিন্দুগুলির সার্থকতা। কিন্তু সেই ধারাকে সম্পূর্ণ অব্যাহত ও বেগবান রাখতে হলে, নদীর আগাগোড়া-প্রবাহিত প্রত্যেক জলবিন্দুকে তার সুদূর উৎপত্তি-ভূমি হতে নিঃসৃত সংস্থিতি-ধারার ঠেলা ও তার সঙ্গে ধারাবাহিক সংযোগ অনুভব করতে হবে। সেই ঠেলা এবং ধারাবাহিক সংযোগ অনুভব করতে না পারলে জল বিন্দুগুলি নদীর ক্রমপ্রবাহিত রূপ ও বেগবত্তা হারিয়ে তার নদীত্ব থেকে চ্যুত হবে এবং কয়েকটি স্রোতহীন বিচ্ছিন্ন পঙ্কিল ব্যাধিকর জলকুণ্ডে পরিণত হবে। একটি জাতির জীবনও ঠিক সেইরূপ। আধুনিকতার মোহে জাতির জীবনধারার কোন একটি যুগে তার

ব্যক্তিগুলি যদি জাতির আদিম উৎপত্তি হতে নিঃসৃত ক্রম-সংস্কৃতি-ধারাকে অবহেলা করে'—তুচ্ছ করে'—তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা'হলে সেই ধারাবাহিকতার ঠেলা ও সংযোগ হারিয়ে জাতির জীবন-ধারার বেগবত্তা সম্পূর্ণ বিনিষ্ট হয়ে যায় এবং জাতির জীবন তার ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্যময় স্রোত হারিয়ে দিশাহীন লক্ষ্যহীন কয়েকটি বিশ্লিষ্ট স্থিতিশীল পঙ্কিল ব্যাধিময় কুণ্ডে পরিণত হয়। যে জাতি তার উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্যধারাগুলিকে ঘৃণা করে, এবং সেগুলির সঙ্গে সংযোগ পরিহার করবার জন্য ব্যগ্র হয়, যে জাতির মহিলারা মা-ঠাকুমাদের এবং পুরুষরা বাপ-দাদাদের চরিত্রের গভীরতম আদর্শ এবং জীবন-প্রণালীর সহজ সরল বৈশিষ্ট্যময় ছন্দপ্রকাশের ধারাকে ঘৃণাভরে অস্বীকার ও পরিহার করে' থিয়েটার, সিনেমা ও বিদেশের আমদানী অতি-আধুনিক যৌনসাহিত্যলব্ধ সম্পূর্ণ বিসদৃশ আদর্শ গ্রহণ করবার জন্য লালায়িত, এবং সেটাকেই সভ্যতার চরম পরিণতি বলে বিশ্বাস করে তৃপ্ত, সে যে মরা নদীর মত বেগশূন্য ও বৈশিষ্ট্য-শূন্য হয়ে একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তার অস্তিত্ব হারাবে, এবং তার ব্যক্তিগণ একটি বিশিষ্ট জাতির স্বভাব ও স্বছন্দ-ধারা হারিয়ে বিশ্বের কাছে মূল্যহীন ঘৃণিত ভারস্বরূপ হয়ে থাকবে, তা নিঃসন্দেহ।

ব্রতচারী তাই প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়েকে বলতে চায়, তোমাদের মা-ঠাকুরমাদের চিরাগত জীবন-প্রণালী—যা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ নয়, তাকে কেবলমাত্র সেকেলে বলে পরিহার কোরো না। কেন না এই সহ-জ প্রণালীগুলি জাতির সংস্কৃতিধারার ধারাবাহিকত্বের বাহকস্বরূপ। এগুলি পরিহার করলে আধুনিকযুগের বাঙ্গালী মেয়েরা বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্যকে লোপ করবার অপরাধে—কেবল ভবিষ্যৎযুগের বাঙ্গালীর কাছে নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবে। আর বাঙ্গালী পুরুষদেরও বলি, বাপ-দাদার চিরাগত জীবন-প্রণালীর মূলীভূত ধারাগুলিকে

যদি আমরা রক্ষা না করি, তা হলে আমরাও ঐরূপ অপরাধে অপরাধী হব।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষিতগণ—বিশেষতঃ যুবকগণ —এটাকে হয়ত বর্ব্বরতা বা সেকেলে কথা বলে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁরা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, এটা কেবল আমার কথা নয় —ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী, যিনি আধুনিকতার অগ্রদূত বলে যুবক-যুবতী সমাজে স্বীকৃত—সেই হ্যাভলক এলিস (Havelock Ellis) বলেছেন—

"জাতি বাঁচে তার নিজস্ব সংস্কৃতি-ধারার মধ্যে—যেগুলি তার আত্মার ও দেহের আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশের অমর সৌন্দর্য্যময় স্বরূপ—এবং যেগুলি প্রতিনিয়ত নূতন নূতন আকারে তার জীবন থেকে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন জাতির এই ক্রম-সংস্কৃতি-ধারাগুলিই বিশ্বমানবের শাশ্বত আনন্দ-সম্পদ ; আর সেই সংস্কৃতি-ধারাগুলির বিনাশে সমগ্র মানব জাতি যে গভীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়—সে ক্ষতি সহস্র সহস্র ব্যক্তির বিনাশের চেয়েও বেশী। কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব একমাত্র তার জাতিগত সংস্কৃতি-ধারায়—তার বংশ-প্রসূত অর্থহীন আদর্শহীন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা-বাহুল্যে নয়।"*

সুতরাং বাঙ্গালী বুঝুক, যে, তার মা-ঠাকুমার যে-সব ব্রত-প্রণালী ও যে-সব সহজ সরল জীবনধারা এবং বিশেষ করে বাংলার নারী-জীবনের আত্মপ্রকাশমূলক ব্রত-নৃত্য-প্রণালী—যা এখনও সুদূর

---

* What the race lives by is its traditions, its power of embodyiung the finest emanations of its spirit and flesh in forms of undying beauty and aspiration which are never twice the same. These traditions it is which are the immortal joy and strength of Mankind, and in their destruction the race is far more hopelessly impoverished than in the destruction of any number of human beings. For it is by his traditions that Man is Man, and not by the number of meaningless superfluous millions whom he spawns over the earth.

HAVELOCK ELLIS—"The Art of Life", XCIX

গ্রামে গ্রামে অবশিষ্ট আছে, সেগুলির মূল্য, এবং যে সব মেয়েরা সেগুলি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের জীবনের আদর্শের মূল্য, বাংলার বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলপ্রসূত স্বধারা-চ্যুত সহস্র সহস্র গ্রাজুয়েট মেয়েদের জীবনের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। বাংলার গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালী জাতির শৌর্য্যবীর্য্যের, ধর্ম্ম-প্রাণতার ও সহজ আনন্দের সংস্কৃতি-ধারামূলক বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীর অবজ্ঞাত রায়-বেঁশে নৃত্য, ঢালি নৃত্য, জারি নৃত্য, কীর্ত্তন নৃত্য ইত্যাদি জাতীয় সংস্কৃষ্টি-ধারার এবং তাদের বাহক নিরক্ষর ও গরীব পল্লীবাসিগণের জীবনের মূল্য, সংস্কৃতি-ধারা-চ্যুত বিশ্ববিদ্যালয়ের শত সহস্র গ্রাজুয়েটের জীবনের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। জাতির এই আবহমান সংস্কৃতি-ধারাগুলোকে যদি আমরা অবহেলা করি ও রক্ষা না করি—উচ্ছৃঙ্খল 'প্রগতি'র ভ্রান্ত আদর্শের মোহে পড়ে যদি 'প্ররক্ষণের' মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা ভুলে যাই, তা হলে বাঙ্গালী জাতির যা কিছু সংস্কৃতি-ধারা এখনও অবশিষ্ট আছে, সেগুলোকে চিরতরে হারিয়ে বাঙ্গালীকে জাতি হিসাবে শাশ্বত কাল নিঃস্ব ও নিরর্থক করবার অপরাধে আমরা বিশ্বের দরবারে অপরাধী হয়ে থাকব। আমি তাই বাংলার শিক্ষিত সমাজকে আহ্বান ও অনুরোধ করি যে, প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন বাংলার আবহমান জীবন-ধারার এই শাশ্বত ছন্দ-রূপগুলিকে প্রত্যেক বাঙ্গালীর শিক্ষার অপরিহার্য্য অংশরূপে ধার্য্য করেন, যাতে করে প্রত্যেক বাঙ্গালী যুগের পর যুগ তার শাশ্বত বাঙ্গালীত্ব বজায় রাখতে পারে —যাতে করে ভবিষ্যৎ যুগের বাঙ্গালী শাশ্বত বাঙ্গালীর মূলীভূত বৈশিষ্ট হতে বঞ্চিত ও বিচ্যুত না হয়।

আমরা প্রগতির বিরুদ্ধে নই। বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানে, শিল্পে এবং আধুনিক যুগের সকল কলাবিদ্যায় পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যেতে হবে; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সংযোগ ও ধারা-বাহিকতা বজায় রাখতে হবে শাশ্বত বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাবধারার,

আদর্শধারার ও ছন্দধারার সঙ্গে। ব্রতচারী সংচেষ্টা বাঙ্গালীকে পিছিয়ে দিতে চায় না, তাকে 'প্রাদেশিকতা'র আদর্শ দেখিয়ে সঙ্কীর্ণ করে রাখতে চায় না। ব্রতচারী এটা জোরের সহিত বলতে চায় যে, ভারতের লোক আগে সম্পূর্ণ ভারতীয় না হলে যেমন প্রকৃত বিশ্বমানবত্ব লাভ করতে পারবে না, তেমনি প্রত্যেক বাঙ্গালী যদি প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তার উৎপত্তি-ভূমির গভীর তলদেশে তার জীবনের শিকড় প্রোথিত করে' তার চিরপ্রবাহিত সংস্কৃতিধারা থেকে জীবনীরস আহরণ করে' পূর্ণ বাঙ্গালী না হয়, তা হলে সে প্রকৃত ভারতবাসী হতে পারবে না। কেবল বস্তুতান্ত্রিকতামূলক বাহ্যিক ঐক্যে বা প্রগতিতে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব এবং ভারতীয়ত্ব রক্ষা হবে না।

বাংলার জাতিগঠনে ব্রতচারীর স্থান

বর্ত্তমান যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই ব্রতচারীর আসল মর্ম্মকথাটি হয় বুঝতে পারছেন না অথবা ভুল বুঝছেন। তার কারণ এই যে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালের শিক্ষা পাশ্চাত্য জগতের ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য জগৎ যে বস্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পেরেছে, এটা স্বীকার্য্য। কিন্তু এটাও ঠিক এবং পাশ্চাত্য জগতের সবচেয়ে চিন্তাশীল সুধীগণ এটা স্বীকার করেছেন যে, পাশ্চাত্য জগতের ভাবধারা খণ্ডতাদোষে দুষ্ট; জীবনের সমগ্রতাকে পাশ্চাত্য জগৎ বহু অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগে আলাদা আলাদা সাধনার চেষ্টা করছে। এতে করে বিরোধ দাঁড়িয়েছে ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে, শারীরিক প্রগতিতে ও আধ্যাত্মিক প্রগতিতে, এবং জাতীয়তার সঙ্গে বিশ্বমানবের ঐক্যের আদর্শে। যতদিন আমরা পাশ্চাত্য জগতের বস্তুবিজ্ঞান-প্রগতির মোহে মুগ্ধ হয়ে তাদের বাহ্যতান্ত্রিক প্রণালীর দ্বারা জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করব, ততদিন আমরাও ভারতের প্রাচীন আদর্শগত জীবনের সমগ্রতাবোধ ও সমগ্রতার সাধনাপ্রণালী হারিয়ে এই খণ্ডবিখণ্ডতার অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাব।

ব্রতচারী চায়, ভারতের ও বাংলার মানুষকে আবার ভারতের সেই নিজস্ব সমগ্রতামূলক আদর্শ ও জীবনের সাধনা প্রণালী ফিরিতে দিতে। বিশ্বজগৎ যে একটা যান্ত্রিক জগৎ নয়, কেবল একটা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাপার নয়, এর সমস্যাগুলির সমন্বয় ও সমাধান যে কেবল বাহ্যিক পদার্থ বিজ্ঞানের তথ্য দ্বারা হবে না, ব্রতচারী এটা বুঝিয়ে দিতে চায়। আর বুঝিয়ে দিতে চায় যে, পাশ্চাত্য জগৎ আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক—এই দুই ক্ষেত্রে যে একটা বিভাগ

করে বসেছে, এই বিভাগ অসত্য। বস্তুজগতের সমস্যার সমাধান ততদিন হবে না, যতদিন না বস্তুজগৎকে আমরা আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্য দিতে দেখতে শিখব।

সৃষ্টির মূলীভূত যে ঐক্য, তাকে আমাদের আবার হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং কি বস্তু-জীবনে কি অধ্যাত্মজীবনে—যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সেই ঐক্যবোধকে নিয়োজিত করতে হবে। এটাই ছিল প্রাচীন ভারতের ধারা; এবং ব্রতচারীরও মর্ম্মকথা এই। যাবে বলে ইংরাজীতে Creative Unity অর্থাৎ সৃষ্টিগত ঐক্য—সেই সৃষ্টিগত ঐক্যের দিক দিয়ে দেখলে বস্তুতান্ত্রিক ক্ষেত্র ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিভাগ নেই। যাকে আমরা জড়বস্তু বলে অবজ্ঞা করি, তার মধ্যেও অসীমের সমাবেশ রয়েছে। একই সত্তার প্রকাশের সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা, আন্তরিকতা ও বাহ্যিকতার মাত্রার তারতম্যে বস্তুজগতের ও অধ্যাত্মজগতের পার্থক্য আমাদের সাধারণ বিচারে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এর ভিতরকার সৃষ্টিগত ঐক্যকে একবার গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলে সব বিভিন্নতা দূর হয়ে গিয়ে এক মহা ঐক্য ও মহা-সমন্বয়ের এবং শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এই মহা-সমন্বয়ের অনুভূতি ভারতীয় সংস্কৃত মন্ত্রে "ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" এই বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রতচারী আপামর মানুষের মনে নিখিল জগৎ-প্রকৃতির এই চূড়ান্ত সমন্বয়ের অনুভূতি আনিয়ে সেই চূড়ান্ত শান্তির সন্ধান দিতে চায়।

এই প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেখলে বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে কোন বিরোধ থাকে না; এবং জাতীয়তায় ও আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যেও কোন বিরোধ থাকে না। ব্রতচারী আদর্শের এই বিরোধবিহীনতার মূল প্রণালীটি আমরা এখন বুঝতে চেষ্টা করব। কিন্তু এটা বুঝতে হলে, ঐ মূল সত্যটি প্রথমে মেনে নিতে হবে যে, বস্তুজগতে ও অধ্যাত্মজগতে কোন প্রাচীর-বিভাগ নেই। মানুষ পৃথিবীর জীব।

একদিকে এই পৃথিবী হতে সে উৎপন্ন, এই হিসাবে তার উৎপত্তি ভূমির সঙ্গে তার আত্মার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। আবার অপর-দিকে এই ভূলোকের সঙ্গে দ্যুলোকের, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, নক্ষত্র-মণ্ডলীর একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। সেই রকম মানুষের জীবনের সঙ্গেও এই দিঙ্‌মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। এতে করে আমরা একটা মহৎ ঐক্যের সূত্র পাচ্ছি, যা সমগ্র বিশ্বের ছন্দশক্তির মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে।

ভূমার এই ঐক্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি জাতি ; অর্থাৎ তার সমগ্র জীবনের মধ্যে ছন্দশক্তির নিয়মের একটা ঐক্যসূত্র রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন কেবল যদি মানুষের কথা আমরা ভাবি, তা হলেও আমরা দেখতে পাব, সমগ্র ভূলোকের মধ্যে যেমন একটা ভূমিগত ঐক্য আছে, সেইরকম এই ভূলোক হতে উৎপন্ন যে সমগ্র মানুষজাতি—দেশে দেশে তার সহস্র বৈচিত্র ও বিভিন্নতা থাকা সত্বেও, তার মানুষগত একটা ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্যের আমরা পরিচয় পাই, মানুষগত বাহিরের আকার-সাদৃশ্যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারম্পরিক আকার-সাদৃশ্যে, এবং মানুষের শরীরের অন্তর্যন্ত্রের কর্ম্মপ্রণালী ও নিয়মের ঐক্যে। মানসিক, চারিত্রিক ও অধ্যাত্ম বৃত্তিগুলির মধ্য দিয়েও সকল মানুষের ভিতর যে একটা গভীর ঐক্য বিরাজ করছে, এটা অবিসম্বাদীরূপে সত্য। কিন্তু এই সকল গভীর ও প্রকৃতিগত ঐক্য সত্বেও মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে অনৈক্যের সৃষ্টি হয় কেন? এই হচ্ছে মানব জীবনের প্রথম ও প্রধান সমস্যা—যেটা বিশেষ করে আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে—কি পাশ্চাত্য জগতে কি প্রাচ্য জগতে—ভীষণ মূর্ত্তিতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মানুষে মানুষে; জাতিতে জাতিতে এই অনৈক্যের সমাধানের চেষ্টা নানা যুগে নানা ভাবে হয়েছে। আজকাল বিশেষ করে এই

সমস্যা সমাধানের তিন রকম চেষ্টা দেখা যায়। এক প্রণালীর লোক আছেন যাঁরা মনে করেন, একটা দেশের মানুষ—যেমন ইংলণ্ডের, কি জাপানের কি জার্মানীর মানুষ—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ; এবং তাদের সভ্যতা ও তাদের সংস্কৃতি সমস্ত বিশ্বে প্রচার করে তারা সকল দেশের মানুষের উপর রাজত্ব করবে। এই উদ্দেশ্য ও আদর্শ জাতীয়তার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সংঘর্ষের একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এক প্রণালীর লোক আছেন, যাঁরা ধর্ম্মবাদী। তাঁরা মনে করেন, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ যদি কোন একটা বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে গ্রহণ করে, তা হলে পৃথিবীর সব মানুষ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হবে। আবার তৃতীয় প্রণালীর লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন—পৃথিবী থেকে সব ধর্ম্মকে তাড়িয়ে দিতে হবে, জাতীয়তাবোধকে তাড়িয়ে দিতে হবে—এক মানুষ আর এক মানুষকে বলবে, আমরা মানুষ—অতএব এক ; কোন মানুষের কোন বিশিষ্ট ভূমিবোধ থাকবে না, কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মবোধ থাকবে না, সব একাকার হয়ে যাবে।

ব্রতচারীর মতে, এর কোনটাই সত্য নয় এবং তিন পন্থার কোনটিতেই পৃথিবীর মানুষ বাস্তব জীবনে তার অন্তর্নিহিত ঐক্যের কোন সন্ধান পাবে না। ব্রতচারীর মতে সৃষ্টিগত ঐক্য ভূমিগত বৈচিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সেই ভূমিগত বৈচিত্রের ভিতর দিয়ে যতক্ষণ আমরা না যাব, ততক্ষণ—কি ধর্ম্মের দিক দিয়ে কি সংস্কৃতির দিক দিয়ে—হাজার বার 'বিশ্বমানবতা' 'বিশ্বমানবতা' বলে চেঁচিয়ে একে অন্যকে আলিঙ্গন করে মানুষ তার প্রকৃতিগত একতা লাভ করতে পারবে না। ব্রতচারী প্রণালীর মর্ম্মকথা এই যে, মানুষ এক ভূলোকজাত হয়েও তার সেই ভূলোকজাত ঐক্যের সন্ধান পাবে একমাত্র তার ভূমিগত বৈচিত্রের সাধনার ভিতর দিয়ে।

মোটকথা, যে সৃষ্টিগত ঐক্যের কথা আমরা বলেছি, তার সন্ধানের ও উপলব্ধির কয়েকটি সৃষ্টিগত ধারা আছে। ধরা যাক,

বাংলার মানুষের কথা। মোটামুটি আমরা বাংলার মানুষের জীবনে সৃষ্টিগত অন্তত তিনটি ধাপ দেখতে পাই। একটি বাংলার মানুষ হিসাবে—বাংলার ভূমিগত ঐক্যের ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ, ভারতের মানুষ হিসাবে—ভারতের ভূমিগত ঐক্যের ধাপ এবং তৃতীয়, ভূলোকের মানুষ হিসাবে—অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে ভূলোকগত ঐক্যের ধাপ। এই তিনটি ধাপের একটিকে অতিক্রম করে অন্যটির নাগাল পাওয়ার চেষ্টা যতই সরল ও সাগ্রহ ভাবে করা যাক না কেন, সৃষ্টিগত ঐক্যনীতির সঙ্গে তার মিল না থাকায় সেই চেষ্টা বিফল হবেই হবে। এর প্রমাণ আজকাল আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে পদে পদে দেখা যাচ্ছে। বাংলার মানুষ নিজেদের মধ্যে তাদের ভূমিজাত গভীর প্রকৃতিগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা না করে নিখিল ভারতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে যতদিন চেষ্টা করবে ততদিন সেই চেষ্টা—ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই হোক, আর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই হোক—বিফল হবেই হবে। সেই রকম ভারতের মানুষ—তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, খৃষ্টানই হোক—যতদিন ভারতের ভূমিগত গভীর ভাব ও ছন্দের ঐক্যধারা-প্রবাহ আপন আপন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে ভারতের সকল মানুষকে এক গভীর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে না পেরেছে, ততদিন কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবতার ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা পণ্ড হবেই হবে।

যে সকল রাষ্ট্রনেতা অথবা রাষ্ট্র-পণ্ডিত বাংলার জাতীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টাকে প্রাদেশিকতা বলে অভিহিত করেন, তাঁরা তদ্দারা সৃষ্টির মূলগত ঐক্যনীতির সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভারতের মানুষকে ঐক্য-সূত্রে গ্রথিক করতে চাই বলেই এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেব মানুষের সঙ্গে ভারতের মানুষকে এক বিশাল ও গভীর ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করতে চাই বলেই—গোড়ায় আরম্ভ করতে হবে

আমাদের নিজেদের ভূমিগত ঐক্যের যোগসূত্র গঠিত করতে। এটাই ঐক্যগঠনের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এটা বোধ হয় এখন সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, ব্রতচারীর উদ্দেশ্য একাধারে আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য গঠন এবং বাংলার জাতীয় ঐক্য গঠন করা; বাংলার জাতিগঠন করা।

জাতিগঠনে তুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যাক্তিকে অন্তরে-বাহিরে পূর্ণ শক্তিমান করা, আর একটি হচ্ছে জাতির সকল ব্যক্তিকে অন্তরে ও বাহিরে ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করা। ব্রতচারী প্রণালীতে এই তুয়েরই উপাদান রয়েছে। এর প্রথম উপাদান অর্থাৎ আদর্শের দিকের উপাদান যোগায় ব্রতচারীর পঞ্চব্রত, পণ, মানা, প্রণিয়ম এবং সেগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ। ব্রতচারীর প্রণালীর আদর্শে আছে জীবনের সমগ্রতা। ইউরোপ আজকাল জীবনের সমগ্রতার আদর্শে হারিয়ে যে অতল ও অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছে, আমাদের দেশের মানুও আজকাল ইউারাপীয় সংকৃষ্টির সংক্রমণে যে খণ্ডবিখণ্ডতার অকূল ও অতল পাথারে নিমজ্জিত হতে বসেছে, তার থেকে ব্রতচারী চায় তাদের উদ্ধার করতে, পঞ্চব্রতের অর্থাৎ জ্ঞান-শ্রম-সত্য-ঐক্য-আনন্দের পরিপূর্ণ আদর্শের সন্ধান দিয়ে; এবং প্রতি দেশের মানুষকে তাদের আপন ভূমি-সংস্থতির সঙ্গে স্বষ্টিগত সংযোগ করিয়ে।

জাতির ঐক্য-গঠনের জন্য যে কি কি উপাদান দরকার, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিতবর্গ সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ বলে আজ আমাদের দেশে নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ও নানা রাষ্ট্রীয় দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপহিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের দরকার এটা সকলেরই স্বীকার্য; কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় ঐক্য যে কি প্রণালীতে স্বষ্টি করতে হবে, সে সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্ট ধারণা কম লোকেরই আছে বলে মনে হয়। অমরা এই প্রবন্ধে যা বলেছি তা যদি সত্য হয়, তা হলে এটা মেনে নিতে হবে যে,

ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংগঠন করতে হলে প্রথমত প্রত্যেক বিশিষ্ট ভূমির—যথা বাংলার—ভূমিগত অর্থাৎ সংকৃষ্টিগত ঐক্যের সংসাধন করতে হবে। তা না করে যদি কেবল ভারতের ঐক্য-সাধনের জন্য চীৎকার করি, তবে তা নিশ্চয়ই নিষ্ফলতায় পরিণত হবে। বাংলার লোকের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের লোকের যে ভাষাগত ঐক্য পর্য্যন্ত নেই, এ সত্যটা আমরা ভুলে যাই এবং এই ভুলের ফলে আমরা বাংলার সংকৃষ্টিগত ঐক্যস্থাপনের কথা ভুলে গিয়ে তার চেয়ে বিশাল একটা সমগ্র ভারতীয় ঐক্য স্থাপন করতে চাই। এতে করে আমরা ভুলে যাই যে, নিজের মধ্যে আগে সমগ্রতা স্থাপন না করে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা বৃহত্তর সমগ্রতা স্থাপন জগতের সৃষ্টিগত প্রণালীর দিক দিয়ে অসম্ভব। সুতরাং বাংলার জাতিগঠনে ব্রতচারীর যে মূল চেষ্টা, তাকে বৃহত্তর জাতিগঠনের প্রথম ও প্রধান সোপান বলে গ্রহণ করতেই হবে।

বাংলার জাতিগঠন কি করে করতে হবে, এই প্রশ্নের উত্তর ক'জন রাষ্ট্রনেতা অথবা রাষ্ট্রপণ্ডিত দিতে পারেন বা কার্য্যক্ষেত্রে তার পরিচয় দিচ্ছেন, জানি না। বাংলাভাষার সংবৃদ্ধি যে এর একট বিশেষ পন্থা, এই সম্বন্ধে বোধ হয় অনেকেরই অল্প-বিস্তর ধারণা আছে। এ ক্ষেত্রে ব্রতচারী আদর্শের সঙ্গে আমাদের দেশের অনেকেরই মতের মিল আমরা পাই। কিন্তু এছাড়া ঐক্য সাধনের অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন-সাধারণের মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। ব্রতচারীর কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা আছে। সেটা হচ্ছে এই, জাতিগঠন করতে হলে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তরে এবং বাহিরে কয়েকটি সূত্র দিয়ে গাঁথতে হবে। সেই সূত্রগুলি হচ্ছে—সমান আদর্শ, সমান অভিরীতি (Convention) এবং সমান ইতিধারা। ব্রতচারী আদর্শের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলার আবালবৃদ্ধকে একটা সমান

আদর্শ দেবার চেষ্টা করছি। বাংলাভাষার ভেজালবিহীন সমান ব্যবহার দ্বারা, বাংলাভূমির প্রতি সমান প্রেমের উদ্রেকের দ্বারা, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাংলার পূর্ব্বতন যুগের মহাপুরুষদের জীবন-আদর্শের গৌরবের সমান অনুপ্রাণনার দ্বারা, বাংলার জাতীয় নৃত্যগীতের পুনঃ প্রবর্তনের দ্বারা, বাংলার নিজস্ব ভাব ও ছন্দধারার পুনঃ-প্রবহনের দ্বারা, আমরা সমগ্র বাঙালী জাতিকে সমান ইতি-ধারার সূত্রে গ্রথিত করতে দেশময় চেষ্টার প্রবর্ত্তন করেছি। জাতীয় সমান আরাবের, আনন্দে-প্রকাশের সমান প্রথার এবং পরস্পর অভিভাষণের সমান রীতির প্রবর্ত্তন দ্বারা আমরা বাঙালী জাতির শতধা খণ্ডবিখণ্ডিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনে সমান অভিরীতির স্থাপন করতে প্রয়াস পাচ্ছি। এক কথায় সমগ্র বাঙালীর মধ্যে অগণিত ঐক্যধারা স্থাপনের যে চেষ্টা আজ ব্রতচারী প্রণালীর ভিতর দিয়ে হচ্ছে, বাংলার ইতিহাসে বা ভারতের ইতিহাসে নানা দিক দিয়ে জাতিগঠনের এরকম একটি বিরাট ও বিজ্ঞান-সম্মত চেষ্টা আর কোন যুগে অন্য কোন পরিচেষ্টার ভিতর দিয়ে একসঙ্গে হয় নি, এটা বোধ হয় জোর করে বলা যেতে পারে।

রাষ্ট্রিয় ক্ষেত্রে মুক্তির জন্য ব্যগ্র যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে ব্রতচারীর কোন বিরোধ ত নেই-ই—বরং এটা জোর করে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা যদি ব্রতচারীর সাহায্য অবলম্বন দ্বারা জাতির লক্ষ লক্ষ বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংনিয়মিত, দেহে মনে চরিত্রে সুগঠিত এবং পরস্পর সমান আদর্শ, ইতিধারা ও অভিরীতির সূত্রে গ্রথিত না করে শুধু একটা রাষ্ট্রীয় বা অর্থনীতিগত বাহ্যিক ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা করেন, তবে মানুষের অন্তরগত ঐক্যস্থাপনের নিয়মকে তাঁরা অবহেলা করবেন; এবং তার ফলে তাঁদের ঐক্য-স্থাপনের প্রশংসনীয় চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে।

ধর্ম্ম-সমন্বয়ে ব্রতচারী *

ব্রতচারী প্রণালীতে আছে, বিশ্বজগতের জীবনের অখণ্ড রূপ। ইহাতে আছে মানুষের জীবনের পূর্ণ অর্থের ও উদ্দেশ্যের সন্ধান, আর আছে দৈনন্দিন জীবনের আচরণের পূর্ণ বিধির নির্দেশ; এবং অন্তর্জীবন ও চরিত্র-গঠনের ও কর্ত্তব্য-পালনের পূর্ণ সাধনা-প্রণালী।

ধর্ম্ম বলতে যা সাধারণতঃ বোঝায়, সেই অর্থে ব্রতচারী একটা আলাদা ধর্ম্ম নয়। কিন্তু সকল ধর্ম্মের সঙ্গে এর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, কারণ জগতের সকল ধর্ম্মের মূলীভূত সত্যগুলির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। আর তাতে করেই এর দ্বারা সকল ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন সম্ভবপর হবে।

ব্রত বলতে বোঝায়, কোন একটি পবিত্র অভীষ্ট সাধন-কল্পে ছন্দোবদ্ধ রীতি-নিয়মের অনুষ্ঠান। ব্রতচারী তাঁকেই বলে, যিনি সমস্ত জীবনকে এই রকম একটি পবিত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং সমস্ত জীবনকে একটি উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্টিত করে ছন্দোবদ্ধ প্রণালীতে তার অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকেন। সেই উচ্চ আদর্শ হবে একাধারে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক; কেননা ব্রতচারীর মতে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে কোন প্রাচীর-বিভাগ নেই। জীবনের এই যে সমগ্র ব্রত, তাকে পাঁচ ভাগ করে—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দ এই পাঁচটি ব্রতে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, এই বিভাগটি খালি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সাধনার সুবিধার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে মাত্র; বাস্তবিকপক্ষে তারা একটি অখণ্ড ব্রতের অবিভাজ্য অংশ।

---

* রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকি ধর্মমহাসম্মেলনে প্রদত্ত ইংরেজী অভিভাষণের মর্মানুবাদ।

সেই পূর্ণ জীবনব্রতের অখণ্ডতা রাখবার জন্য এই পঞ্চব্রতের সাধনা একাধারে অর্থাৎ একসঙ্গে করতে হবে। একটাকে ছেড়ে অন্য ব্রতগুলির সাধনা করলে, সেই সাধনা খণ্ডতা-দোষে দুষ্ট হবে এবং জীবন অপূর্ণ হবে।

ব্রতচারী কোন সম্প্রদায়-বিশেষের অথবা কোন শ্রেণী-বিশেষের জন্য নয়। ইহা আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জাতির সকল মানুষের জীবনের পূর্ণতা লাভের সাধনা-পন্থা। এতে আছে, চরিত্র-গঠনের, শরীর-গঠনের, কর্ম্ম-সাধনার, শ্রম-সাধনার এবং জাতীয় নৃত্যগীতের ভিতর দিয়ে সমষ্টিগতভাবে আনন্দ ও ঐক্য-সাধনার উপাদান। এর বাহ্যিক অভিরীতির মধ্যে আছে একটি সমসাধারণ অভিবাদন-প্রণালী, সম্বোধন-প্রণালী ও সজ্ঘ-আরাব। সকল শ্রেণীর ও সকল বয়সের মানুষের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পূর্ণ বিধি-নির্দ্দেশ এতে আছে।

এই যে পাঁচটি মূলীভূত ব্রতের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কার্য্যে পরিণত করবার জন্য বাংলার ব্রতচারীকে নিতে হয় ষোলটি পণ ও সতেরটি মানা। পণগুলিতে বেশী করে জোর দেওয়া হয়েছে—শ্রমের মর্য্যাদা ও আবশ্যকর্ত্তব্যতার উপর, জীবনের স্বাস্থ্য ও শুদ্ধতা সম্পাদনের উপর এবং প্রাণের আনন্দ বিধানের উপর। ছোট ব্রতচারী অথবা ছো-বদের জন্য যে বারটি পণ আছে, সেগুলি তাদের জীবন-গঠনের বিশেষ উপযোগী।

বর্ত্তমান যুগে মানুষের জীবন কি অন্তঃক্ষেত্রে কি বহিঃক্ষেত্রে সংগ্রামে সংঘর্ষে, অনৈক্য ও অসমন্বয়ে শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার প্রধান কারণ এই যে, বর্তমান যুগে মানুষ জীবনের অখণ্ডতা ভুলে গিয়ে তাকে আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানের প্রণালীতে বিখণ্ডিত করে দেখবার প্রয়াস করেছে, আর তার অখণ্ড জীবনকে বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, শরীর, মন, চরিত্র ইত্যাদি নাম দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা কোঠায় বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকটির সম্পূর্ণ আলাদা

আলাদা ভাবে চর্চ্চা করবার চেষ্টা করছে। আর বিশ্বের মূলীভূত যে ছন্দশক্তি, তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও উপেক্ষা করে জীবন থেকে বহির্ভূত করে দিয়েছে; এবং তারফলে সাধারণ মানুষের জীবনে এই ছন্দশক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে।

জীবনের এইরূপ পৃথক পৃথক কোঠা-বিভাগের ফলে ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান উভয়ই ঐনৈক্য ও দ্বন্দ্বের উৎপাদক হয়ে পড়েছে; এবং সাধারণ মানুষের জীবন ছন্দের সমন্বয়-বিধায়ক শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে বিখণ্ড ও অন্তর্বিরোধময় হয়ে পড়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও শারীরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি পৃথক পৃথক কোঠবিভাগের অতি বিষময় ফল ফলেছে, যাতে করে বর্তমান যুগে মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত না হয়ে এখন একটা অস্বাভাবিক জীব হয়ে পড়েছে, যার কি বহির্জীবনে কি অন্তর্জীবনে, কি ব্যক্তিগতজীবনে কি সামাজিক জীবনে, না আছে শান্তি না আছে সমন্বয়।

ব্রতচারী সংচেষ্টা চায় মানুষের জীবনকে এই অস্বাভাবিক বিখণ্ডতা থেকে মুক্ত করে আবার আদর্শের পূর্ণতা ও আচরণের সমন্বয় দান করতে, যাতে করে প্রত্যেক মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বমানবের সঙ্গে এবং তার আপন মাতৃভূমির সংস্কৃতিধারর সঙ্গে স্বাভাবিক ও সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। তা ছাড়া এই সংচেষ্টা প্রত্যেক মানুষকে দিতে চায় এমন সহজ সরল সাধনা-পন্থার সন্ধান—যার দ্বারা সে তার অন্তর্জীবনকে সংনিয়মিত করতে পারবে এবং কি জাতীয় কি আন্তর্জাতিক জীবনে ঐক্যের গভীর উপলব্ধি প্রাণের মধ্যে আনতে পারবে।

ব্রতচারী-আদর্শবাদের মতে বিশ্বপ্রকৃতির ও বিশ্বমানবের জীবন আনন্দ থেকে উৎপন্ন ও আনন্দের উপর সংস্থিত। সুতরাং জীবনের কি বাহ্যিক কি আন্তরিক—কি দৈহিক কি আধ্যাত্মিক, যে কোন দিক হোক না কেন—তার ক্রিয়া যদি আনন্দের উপর এবং আনন্দ-সঞ্চারক ছন্দসাধনার উপর সংস্থিত না হয়, তাহলে তা

অবাস্তব ও পূর্ণতাহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই ছন্দ-সাধনায় লক্ষ্য হওয়া চাই যুগপৎ অধ্যাত্ম এবং ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে পরিপূর্ণ আদর্শ। এই পরিপূর্ণ আদর্শ নিহিত আছে,—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দ—ব্রতচারীর এই পঞ্চব্রতের মধ্যে।

এই পঞ্চব্রতের একাধারে সাধনা দ্বারা মানুষ পারবে জীবনের অখণ্ডতার সংবিধান করতে, বিশ্বমানবের সঙ্গে প্রাণের ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে এবং জীবনের পূর্ণ সমন্বয়ের দ্বারা পূর্ণানন্দ লাভ করতে। একটা উচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শ লক্ষ্য করে ছন্দসাধনা ব্যতীত মানুষের পক্ষে একদিকে যেমন নিজের অন্তর্জীবনের উপর স্বরাজ্য স্থাপন অসম্ভব, তেমনি অপর দিকে মানুষে মানুষে পরস্পর ঐক্য-স্থাপনও অসম্ভব; সুতরাং যেমন ব্যক্তি-জীবনের সুসমঞ্জস পূর্ণ-বিকাশের দিক থেকে তেমনি জাতীয় জীবনের এবং আন্তর্জাতিক জীবনের পূর্ণ ঐক্য-স্থাপনের দিক থেকে ছন্দের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। এই দিক থেকে দেখতে গেলে ব্রতচারী সংচেষ্টা ভারতের প্রাচীন আদর্শেরই নবরূপে প্রকাশ। তা ছাড়া বিখ্যাত গ্রীক মনীষী প্লেটোবর্ণিত প্রাচীন গ্রীসের মনুষ্য-গঠনের আদর্শের সঙ্গে এর আশ্চর্য্য মিল দেখতে পাওয়া যায়।

এই যে শরীর,মন ও বাক্যের যুগপৎ ছন্দ-সাধনা, এর মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক শক্তি নিহিত রয়েছে, যাতে করে এনে দেয় জ্ঞানলাভের তীব্র অনুরাগ, শ্রমের ও কর্ম্মের তীব্র আগ্রহ সরলতার ও সত্য আচরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনে সখ্য ও ঐক্যের তীব্র পিপাসা, এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নির্ব্বিশেষে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আনন্দের অদম্য সঞ্চারণ।

বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মজীবন থেকে ছন্দসাধনার যে বিচ্যুতি ঘটেছে, সেটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর লক্ষণ। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী হ্যাভলক এলিস তাঁর 'জীবননৃত্য' নামক পুস্তকে প্রতিপাদন করেছেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম তার প্রাথমিক অবস্থায় ছন্দাত্মক উপাসনার

মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে; এবং তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, যখনই কোন একটা জীবন্ত ধর্ম্ম পৃথিবীতে আসে—যেটা যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাণহীন ব্যাপার নয়, পরন্তু আত্মার ঐকান্তিক আত্মপ্রকাশ—তখনই সে রূপায়িত হয় কোন না কোন প্রকার ছন্দোবদ্ধ উপাসনা অর্থাৎ নৃত্যের মধ্য দিয়ে। বস্তুতঃ আমরা দেখতে পাই, বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত একাধিক বহুব্যাপক ধর্ম্মে উপাসনার আহ্বান এবং উপাসনার প্রণালীতে আছে ছন্দাত্মক সুরবিন্যাস এবং দেহের ছন্দাত্মক গতিবিন্যাস। একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি মহাপুরুষের জীবনের এবং অপর দিকে সুফি-সম্প্রদায়ের সাধকদের জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, অন্তরের গভীর অধ্যাত্ম আরাধনা স্বভাবতই আত্মপ্রকাশ করে সহজ ছন্দের নৃত্য ও গীতের রূপের মধ্য দিয়ে।

ব্রতচারী আদর্শের ও আচারের দুটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে—জনসেবায় আত্মনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্ত্তব্য-সাধনমূলক কর্ম্মসম্পাদনে আগ্রহ। কর্ত্তব্যের ও কর্ম্মের আদর্শ যখন কায়-মনোবাক্যে ছন্দের রূপে প্রকাশ পায় তখন তার ফলে সেই কর্ম্মের আনন্দময় সংসাধনের একটি অপ্রতিহত শক্তির সঞ্চার হয় যাতে করে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের জড়তা ও কর্মবিমুখতা স্বতই নির্ব্বাসিত হয়। তাই ব্রতচারী সংচেষ্টার ভিত্তি অধ্যাত্ম আদর্শে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও এই সংচেষ্টা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের কর্ত্তব্য সংসাধনের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং কর্ম্মের ও জনহিতসাধনের আনন্দে আত্মবিস্মৃতির ভিতর দিয়ে বহুর মধ্যে ব্যক্তির আন্তরিক প্রাণের মিল ঘটিয়ে দেয়। সমগ্র বাংলাদেশময় ব্রতচারীর এই কর্ম্ম-প্রেরণার দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। যেখানেই এই প্রচেষ্টা প্রসার লাভ করেছে, সেখানেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পল্লী-সংগঠনের বিপুল সাড়া পড়েছে।

ব্রতচারীর পণ, নৃত্য ও গানগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে,

এগুলির দ্বারা মানুষের জীবনের প্রত্যেক বিভাগের যুগপৎ ছন্দোবদ্ধ সংনিয়মের ফলে ব্যক্তির অন্তর্জীবনের বিশুদ্ধতা সাধিত হয়; তমোবৃত্তিগুলিকে দমন করবার শক্তি লাভ হয় এবং ব্যক্তি তার অন্তর্জীবনের উপর আধিপত্য ও প্রকৃত স্বরাজ্য লাভ করতে সক্ষম হয় এর সাহায্যে। এক দিকে যেমন চরিত্র সুগঠিত হয়, তেমনি অপর দিকে আবার দেহের শক্তি সংসাধিত হয়। আর, এ দুটোর মধ্যে একটাকে অতিক্রম করে অন্যটির অতিরিক্ত বৃদ্ধি না হয়ে দুটিরই সুসমঞ্জস বিকাশ সাধিত হয়।

ব্রতচারী-সাধনা প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীকে বিশ্বের আদর্শ-পৌরজন হবার শক্তি এনে দেয় বটে, কিন্তু এর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মতে বিশ্বপ্রকৃতির একত্বের সন্ধান লাভ করা একমাত্র সম্ভব তার বিভিন্ন ভূমিগত বৈচিত্র্যের সাধনার ভিতর দিয়ে—যে-বৈচিত্র্য প্রত্যেক ভূমিজাত আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিগত ক্রমধারার রূপে প্রকাশ পায়। এই দ্বিবিধ সাধনা ব্রতচারীকে যুগপৎ করতে হবে বলে প্রত্যেক ব্রতচারীকে যুগপৎ দ্বিবিধ পণ নিতে হয় এই মর্ম্মে যে, সে যেমন এক দিকে বিশ্ব-মানবের জীবনের সঙ্গে তার মূলীভূত ঐক্যের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করবে, তেমনি অপরদিকে তার ভূমিগত মাতৃকার সংস্কৃতিধারার ভিতর দিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করবে। এই দ্বিবিধ আনুগত্যের সাধনার ফলে ব্রতচারী জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির আদর্শের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঐক্যের ও শান্তির সমন্বয় করতে সমর্থ হয়। যেগুলিকে সাধারণত পরস্পর বিপরীত লক্ষ্য বলে মনে করা হয়, সেগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের ব্রতচারীর এই প্রতিভা যে কেবলমাত্র একটা কাল্পনিক কথা নয়, এর প্রমাণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পাওয়া গেছে। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, বাংলা দেশে ব্রতচারী যেমন এক দিকে বাংলার একটি তীব্র জাতীয়তাবোধ দিতে সমর্থ হচ্ছে, তেমনি আবার বাংলা দেশে এই সংচেষ্টা বাংলার ভাষা এবং বাংলার জীবনধারার ভিতর

দিয়ে রূপায়িত হচ্ছে বটে, কিন্তু এর মূলীভূত প্রণালীগুলি ভারত মহাভূমির অন্যান্য ভূমিখণ্ডের পক্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভূমির পক্ষেও প্রযোজ্য ;* এবং প্রত্যেক ভূমিতে একে সেই ভূমির নিজস্ব ভাষা, ছন্দ ও সংস্কৃতি-ধারা এবং জীবনসমস্যার ভিতর দিয়ে রূপায়িত করতে হবে।**

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীতে বর্ত্তমান যুগে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও জাতিতে জাতিতে যে ভীষণ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের উৎপত্তি হয়েছে, তার নিরাকরণ করে ব্যবহারিক জীবনে ও ধর্ম্ম-জীবনে গভীর শান্তি ও সমন্বয় আনবার শক্তিমত্তা রয়েছে ব্রতচারী সাধনায়। কেন না এর ভিতর দিয়ে প্রত্যেক মানুষ তার জন্মগত ছন্দশক্তির বিকাশ করে' সাবলীল আত্মপ্রকাশ দ্বারা একদিকে যেমন ব্যক্তিজীবনে পূর্ণ মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করতে সক্ষম হবে, আবার অপরদিকে তেমনি পঞ্চব্রতমূলক পূর্ণ আদর্শ লাভ করে' এবং বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত ছন্দশক্তি ও আনন্দশক্তির উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে' ভূমার অখণ্ড ঐক্য ও অদ্বৈততার উপলব্ধি জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতানির্ব্বিশেষে সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মের লোক, ভারতের অন্যান্য ভূমিখণ্ডের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাংলা-প্রবাসী নরনারী ব্রতচারী আদর্শকে সাদরে এবং সানন্দে গ্রহণ করেছেন এবং এর ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-

---

* বরদার মহারাজা গাইকোয়াড় এবং হায়দরাবাদের নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যর আকবর হায়দরীর মতে এতে সমগ্র ভারতের মানুষের শারীরিক ও চারিত্রিক শক্তি-বিকাশের এবং জাতীয় ঐক্যগঠনের উপাদান বিদ্যমান আছে।

**ইংলণ্ডের মতো প্রগতিশীল ভূমির পক্ষেও যে এই সংচেষ্টার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা রয়েছে তা স্যর মাইকেল স্যাডলার, লরেন্স বিনিয়ন এবং স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড প্রমুখ মনীষিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন এবং শেষোক্ত মনীষী ইংলণ্ডে এই সংচেষ্টা বিস্তার করবার ভার স্বেচ্ছায় ও সাদরে গ্রহণ করেছেন।

নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব যোগসূত্র স্থাপিত হবার সূত্রপাত হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের বালক-বালিকাদের শরীর ও চরিত্রের যুগপৎ সুসমঞ্জস বিকাশের আশ্চর্য্য শক্তির অবতারণা এর ভিতর দিয়ে হয়েছে ; এবং অতি অল্প কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালী জাতির কর্ম্মবিমুখতা ও অলসতা কিম্বদন্তীর মতো হয়ে পড়েছিল, সেই জাতীর জীবনের মধ্যে আনন্দের একটি অপূর্ব্ব অভিসিঞ্চন এবং কর্ম্মসাধনের অপূর্ব্ব আগ্রহ এনে দিয়েছে। এতে করে দৃঢ় আশা করা যায় যে সমগ্র ভারতে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ব্রতচারী-সাধনার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করতে পারলে এর দ্বারা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ঐক্য, আনন্দ ও জনহিতসাধনের উৎসাহসৃষ্টির দ্বারা দিব্যজীবন লাভের পথ উন্মুক্ত হয়ে উঠবে !*

* ইংলণ্ডের বিখ্যাত মহিলা কর্ম্মী এবং স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-ধর্ম্মমহাসভার বিশিষ্ট সভ্যা কুমারী উইনিফ্রেড রেঞ্চ প্রকাশ্যভাবে ব্রতচারী ভুক্তি গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন— "ব্রতচারী আদর্শের ভিতর দিয়ে আমার আত্মা মুক্তির সন্ধান পেয়েছে।"

আত্মগঠন ও জাতিগঠনে ব্রতচারী-পদ্ধতি অত্যাবশ্যকতা

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপরিষদের—তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রফেসর ফ্রেডারিক ক্লার্ক ব্রতচারী পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ঃ—

"বর্ত্তমান যুগের মানুষের জীবন অতিমাত্রায় বাহ্যিক স্তরে চালিত হচ্ছে। এই যুগে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন মানুষের জীবনের অন্তস্তরের প্রভাবকে বিশেষ করিয়া ফুটিয়ে তোলা। ইহার সংসাধন কার্য্যে ব্রতচারী পরিচেষ্টা অতি মূল্যবান সাহায্য করবে।"

বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল দেশে কি ব্যক্তির জীবনে, কি জাতির জীবনে, কি আন্তর্জাতিক জীবনে যে ভীষণ বিরোধ দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রধান কারণ—বর্ত্তমান যুগে মানুষের জীবন প্রধানতঃ বাহ্যিক স্তরে চালিত হচ্ছে। মানুষের জীবনের অন্তরতম স্তরে যে আধ্যাত্মিক সত্তা নিহিত আছে, তার প্রভাব থেকে মানুষ তার বাহ্য জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে বিযুক্ত করে ফেলেছে। এই বিযুক্তির ফলে বর্ত্তমান যুগে উৎপত্তি হয়েছে ধর্ম্মের, সঙ্গে বিজ্ঞানের ও প্রগতির দ্বন্দ্ব এবং বস্তুতান্ত্রিকতার চরম পরিণতি যাতে করে মানুষ তার গভীর আধ্যাত্মিক দেবচরিত্রের সন্ধান হারিয়ে পরস্পর হিংসা-কলহে, দ্বন্দ্বে ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সহজ কথায় বলতে গেলে আমরা বাংলার বাউল-কবিদের ভাষায় বলতে পারি যে, এই যুগের মানুষ তার 'মনের মানুষে'র সঙ্গে সংযোগ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে ; আর কেবল যে হারিয়ে ফেলেছে তা নয়, মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার ও যুক্ত হবার যে গভীর আকাঙ্ক্ষা বাংলার বাউলের—

"আমার মনের মানুষ খুঁজে বেড়াই
পাই না তার অন্বেষণ"—

এই অনুপম গীতাবলীতে প্রকাশ হয়েছিল, সেই আকাঙ্ক্ষাটিও হারিয়ে ফেলেছে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে কয়েকটি স্তর রয়েছে। তার শরীর ও ইন্দ্রিয়াশ্রিত মন এই দুটোর সম্মিলনে বাহ্য মানুষের তৈরী। কিন্তু তার চেয়ে গভীরতর স্তরে যে অন্তর্মন বা অন্তরাত্মা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছে তাকেই বাউল কবি "মনের মানুষ" বলেছেন। বাইরের মানুষের উপর মনের মানুষের আধিপত্যের বিচ্যুতি যখন ঘটে, তখনই বাইরের মানুষটি মনের মানুষের থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে ও তার জীবন আত্মার অন্তরাদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে কেবলমাত্র বাহ্যিক তমসাচ্ছন্ন আদর্শে চালিত হয়। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে মানুষের জীবনে মনের মানুষের আধিপত্যের হ্রাস বা সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেছে, এই কথাটাই প্রফেসর ফ্রেডারিক ক্লার্ক তাঁর উপরোক্ত অভিমতে ব্যক্ত করেছেন।

মনের মানুষের প্রভাব যখন বাহ্য জীবনে অনুভূত না হয়, তখন মানুষের নিজের জীবনের মধ্যে একটা অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তার ফলে তার জীবন পরিপূর্ণতা ও পূর্ণ সমন্বয় লাভ না করে খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে অস্বাভাবিক ও অমানুষোচিত হয়ে পড়ে ; সাত্ত্বিক ভাব থেকে চ্যুত হয়ে তার জীবন তমোভাব দ্বারা চালিত হয়। আবার অপর দিকে এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের ও এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির সম্বন্ধ, মনের মানুষের গভীর আধ্যাত্মিক ঐক্যভাব হতে চ্যুত হয়ে, পরস্পর হিংসা ও দ্বেষের ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে—যেমন আধুনিক জগতে হয়েছে। মনের মানুষই ব্যক্তির প্রকৃত "স্ব" এবং তার ভাবই ব্যক্তির প্রকৃত 'স্ব'-ভাব।

সুতরাং আমাদের সামনে এখন এই দ্বিবিধ সমস্যা উপস্থিত। প্রথমতঃ প্রত্যেক মানুষের জীবনের ভিতরের মনের মানুষটিকে জাগ্রত করে তার বাহ্য জীবনের উপর অর্থাৎ তার ইন্দ্রিয়রাজ্যগত

শরীর ও মনের উপর সেই মনের মানুষের প্রভাব বিস্তার করতে হবে ; ইন্দ্রিয়াশ্রিত মনকে মনের মানুষের আদর্শে চালিত করে অন্তঃশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি সাধিত করতে হবে, এবং "স্ব"-ভাবের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান বিদূরিত করে অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার এনে বিশ্বমানবের সমাজে যথার্থ ও গভীর ঐক্যের সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ মানুষের সামনে দুইটি সাধনা—আত্ম-গঠন ও ঐক্য-গঠন,—জাতীয় ঐক্য ও আন্তর্জাতিক ঐক্য গঠন।

এ দুটির প্রথমটি সাধনা না করে দ্বিতীয়টির সাধনায় সিদ্ধি অসম্ভব। বর্ত্তমান যুগে সকল দেশেই শিক্ষাপ্রণালীতে যথার্থ আত্ম-গঠন বা 'স্ব'-ভাব গঠন পদ্ধতির অভাব ঘটেছে বলেই জাতিগত ঐক্য ও আন্তর্জাতিক ঐক্য সুসংস্থাপিত হতে পারছে না।

তাই ব্রতচারী-পদ্ধতির প্রথম লক্ষ্য আত্মগঠন ; ও দ্বিতীয় লক্ষ্য মানুষে মানুষে—প্রথমতঃ জাতির মধ্যে ঐক্য গঠন অথবা সংক্ষেপে জাতি গঠন ; এবং তার পর জাতিতে জাতিতে ঐক্যগঠন, অথবা আন্তর্জাতিক শান্তি ও ঐক্য-স্থাপন।

অন্যান্য শিক্ষা-পদ্ধতি অধিকাংশ ভাবে বহির্মুখী ; ব্রতচারী-পদ্ধতি অন্তর্মুখী। ব্রতচারী-পদ্ধতির উদ্দেশ্য প্রথমতঃ প্রত্যেক মানুষের জীবনে তার মনের মানুষের আধিপত্য স্থাপন করা ; বহির্জীবনকে অন্তর্জীবনের অনুগত করে চালিত করা ; শরীরকে মনের অনুগত করে চালিত করা ; আবার বহির্মনকে অন্তর্মনের অনুগত করে চালিত করা, অর্থাৎ অন্তর্মন বা আত্মাকে সমস্ত জীবনের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে ব্যক্তির জীবনে প্রকৃত স্বরাজ বা অন্তঃস্বরাজ স্থাপন করা। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই প্রকৃত স্বরাজ বা অন্তঃস্বরাজ স্থাপন না করে আমরা বাইরের স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টায় আছি, এটাই বর্ত্তমান যুগের বহির্মুখী জীবনের ও অন্তর্মুখীতার অবহেলার একটি

প্রকৃষ্ট লক্ষণ। জাতি-স্বরাজ-লাভের চেষ্টায় আমরা আজকাল অতি-মাত্রায় ব্যস্ত। কিন্তু আমরা এটা ভুলে গেছি যে ব্যক্তি-স্বরাজ বা অন্তঃস্বরাজ-লাভের সাধনা না করে' জাতি-স্বরাজ লাভ করার চেষ্টার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। জাতিগত স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের যোগ্যতা তখনই আমাদের হবে যখন আমরা ব্যক্তিগত অন্তঃস্বাধীনতা ও অন্তর্মুক্তির সাধনা জীবনে ফলবতী করে তুলতে পারব। এই অন্তঃস্বরাজ, অন্তঃস্বাধীনতা বা অন্তর্মুক্তি লাভ করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরের অন্তর্মানুষকে দিতে হবে আমাদের জীবনের বাহ্য স্তরের উপর অর্থাৎ শরীর ও মনের উপর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার; এই সাধনাই প্রকৃত আত্মগঠনের সাধনা। এর জন্য দুটি জিনিষের প্রয়োজন—একটি বিশুদ্ধ অন্তরাদর্শ বা অন্তর্লক্ষ্য, আর অন্যটি হচ্ছে এই অন্তরাদর্শকে বা অন্তর্লক্ষ্যকে মন ও শরীরের উপর প্রভাবান্বিত করে, তোল্‌বার কার্য্যকরী প্রণালী।

ব্রতচারী পদ্ধতির পঞ্চব্রত, পণ, মানা, প্রণিয়ম এবং ব্রতচারী গীতির বিশুদ্ধ ও উচ্চ ভাবের মধ্যে আছে প্রথম উপাদানটির প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। আর দ্বিতীয় উপাদানটির ব্যবস্থা আছে যুগপৎ কায় মন ও বাক্যের ছন্দোবদ্ধ পরিচালনায়। এই যুগপৎ কায় মন বাক্যের ছন্দোবদ্ধ পরিচালনার সাহায্যে ব্রতচারী তার সুগভীর অন্তর্জীবনের মহৎ আদর্শগুলিকে জীবনের সমগ্র স্তরে ওতপ্রোতভাবে অনুছন্দিত ও অনুপ্রেরিত করে জীবনের বাহ্যস্তরগুলিকে অন্তরাদর্শের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত করে তুলে আত্মশুদ্ধি, আত্মনিয়ন্ত্রন ও আত্মস্বরাজ স্থাপন করেন। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাকে নিজের মনের পরিকল্পনার অনুরূপ করে গঠন করে তোলে, ব্রতচারী তেমনি যুগপৎ কায়, মন ও বাক্যের ছন্দসাধনার দ্বারা বাহ্য জীবনকে—অর্থাৎ শরীর মনোবৃত্তি ও চরিত্রবৃত্তিগুলিকে আত্মার গভীর প্রবিত্র আদর্শের অনুরূপ গঠন করে তুলতে সক্ষম হন—এবং নিজের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণের ভার নিজেই গ্রহণ করেন।

আত্ম-গঠন ও আত্ম-সৃষ্টির, চরিত্র-গঠন ও চরিত্র-নিয়ন্ত্রণের এই যে ছন্দাত্মক আভ্যন্তরীণ সাধনা-প্রণালী, এটিই হচ্ছে এই ক্ষেত্রে সব চেয়ে বিজ্ঞান-সঙ্গত, সব চেয়ে শক্তিশালী ও কার্য্যকর। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করেই শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবী চৌধুরাণী বলেছেন :—

"ব্রতচারী প্রগতির বাইরের শরীরটা হচ্ছে কতকগুলি নৃত্য, কিন্তু তার ভিতরের আত্মা হচ্ছে কতকগুলি ব্রত।……পণগুলি বা ব্রতগুলি অস্থিমজ্জাগত করে দেবার জন্য জপের মত সেগুলি বারম্বার আওড়ানো বিশেষ ফলপ্রদ। ……যেখানে যেখানে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ে ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী আছেন, সেখানে সেখানে এই মন্ত্রগুলির নিত্য জপ ও নৈমিত্তিক অপ্রষ্ঠান যে দেশের মানসিক হাওয়া বদলে দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ যদি নিজেকে অন্তরে বাহিরে চরিত্রের দিক দিয়ে মানুষ হিসাবে ক্রমোন্নত ক'রে শক্তিশালী করে' তুলতে চায় তবে ব্রতচারী প্রণালী অবলম্বনই তার সিদ্ধিলাভের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়।

মানুষের সত্তা হচ্ছে দেহ, মন ও আত্মা এই তিন স্তরে গঠিত। আজকাল বেশীর ভাগ দেশে বেশীর ভাগ লোক ও বেশীর ভাগ শিক্ষাপ্রণালীই হয় কেবল প্রধানত দেহের চর্চ্চা নিয়ে অথবা প্রধানত মনের চর্চ্চা নিয়ে—অথবা কেবল দেহমনের চর্চ্চাতে ব্যাপৃত। সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ থেকে অধ্যাত্ম-জীবনের চর্চ্চাকে মানুষ দূর করে একটা আলাদা কোঠায় রেখে দিয়েছে। তার ফলে বর্ত্তমান যুগে মানুষের জীবন অতি শোচনীয় ভাবে খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছে।—এটা বিশেষ করে দেখা যায় আজকালকার ব্যায়াম, খেলাধূলা বা শরীর-চর্চ্চার প্রণালীতে। এগুলিতে হয় আছে বেশী করে কেবল মাত্র দেহের শক্তিবৃদ্ধির প্রণালী, অথবা পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক উত্তেজনাপ্রদ চেষ্টা। এতে করে মানুষ একদিকে নিজের অন্তরে খণ্ড-বিখণ্ডিত হচ্ছে এবং

অপর দিকে এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের অন্তরগত বিচ্ছিন্নতার ও শত্রুতার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ব্রতচারী প্রণালী ও ব্রতচারী সাধনায় দেহের ব্যায়ামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে মনের ও আত্মার ক্রমোন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা। এটা সংসাধিত হয় ব্রতচারী নৃত্যগীতের ছন্দোবদ্ধ সাধনার সহায়তায়। দেহের চর্চ্চা যখন সঙ্গীতের ছন্দ-সাধনা থেকে বিযুক্ত হয়, তখন সে অধ্যাত্মভাব থেকে বিচ্যুতি ঘটায়—মানুষকে দেবভাবাপন্ন না করে আসুরিক ও হিংস্রভাবাপন্ন করে তোলে।

প্রাচীন গ্রীসের মনীষিগণ ও রাষ্ট্রনেতাগণ এটি অতি স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই প্রাচীন গ্রীসের শারীর-শিক্ষা-প্রণালী ব্রতচারী প্রণালীর মতই সঙ্গীতের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে ও ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিল। এমন কি প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স ও স্পার্টার বিখ্যাত বীরসৈন্যদলের শারীর-শিক্ষা প্রণালীও ঠিক ব্রতচারী প্রণালীর অনুরূপ সঙ্গীতের সঙ্গে গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। বিখ্যাত গ্রীক মনিষী প্লেটো তাঁর The Republic নামক গ্রন্থে বলে গেছেন :—

"কড়া জিমনাষ্টিক ব্যায়ামের সঙ্গে যদি সঙ্গীতের ও উচ্চ আদর্শ-মূলক প্রেরণার সংযোগ না থাকে, তবে তার চর্চ্চার ফলে মানুষের আত্মা দুর্ব্বল খঞ্জ ও অন্ধ হয়ে পড়ে—কারণ শুধু শরীরের বাহ্যিক চর্চ্চাতে আত্মা না পায় তার জাগরণ, না পায় তার খোরাক। যে মানুষ শুধু এই প্রকার বাহ্যিক শরীর-চর্চ্চা করে সে হয়ে যায় গোঁয়ার, যুক্তিহীন ও সঙ্গীতহীন। সে পশুর মত বাহ্যিক বল-প্রকাশে মত্ত হয়ে, হিংস্র প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে পড়ে এবং মোহপরায়ণ ভাবে জীবন যাপন করে।"*

* "The result of hard gymnastic exercises and good living with no participation in music and philosophy is that the soul becomes weak and lame and blind, being never roused and never fed. Such a man becomes a hater of reason and unmusical and accomplishes his aims by violence and fierceness like a brute beast and lives in ignorance and ineptitude."

এই ত গেল ছন্দ ও সঙ্গীত-সাধনার সঙ্গে শরীর-সাধনার সাধারণ সম্বন্ধ। এছাড়া বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক মানুষের দেহ ও মন তার আপন জন্মভূমি বা স্বভূমি থেকে জাত। সুতরাং তার জন্মভূমিগত ছন্দধারার সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের দেহ-মনের একটি অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। স্বভূমির ছন্দধারার সঙ্গে তার শিক্ষার ও সাধনার যদি বিচ্যুতি ঘটে, তবে সেই শিক্ষায় বা সাধনায় তার চরিত্র ও আত্মা মৌলিকতাহীন ও বলহীন হয়ে পড়ে, যা আজকাল বিশেষ করে দোঁ-আসলা ফিরিঙ্গীদের চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। স্বজাতীয় ভাষা, স্বজাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যগীতের চর্চ্চা যদি শারীর-শিক্ষার ও মানসিক শিক্ষার প্রণালীর একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ না হয়, তবে সে শিক্ষায় ব্যক্তির মন, চরিত্র ও আত্মা কখনো আত্মপ্রতিষ্ঠ, প্রকৃত শক্তিশালী ও মহৎ হ'তে পারে না। স্বজাতীর ছন্দধারার সঙ্গে শারীর-শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যেমন ছিল প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাপ্রণালীতে তেমনি ছিল বাংলার মানুষের জীবনের প্রাচীন পদ্ধতিতে। গ্রীক মনীষী প্লেটো একদিকে যেমন বলেছেন—"যে মানুষ নৃত্য ও গীতে শিক্ষা পায় নি, সে প্রকৃত ও পূর্ণ শিক্ষিত নয়"—তেমনি বাংলার মানুষের জীবনেও প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে নৃত্যগীতের সাধনা ধর্ম্মের সঙ্গে ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বাউল, জারি, ভাটিয়াল, কীর্ত্তন—এগুলির আনন্দময় ও অবলীলাময় চর্চ্চার ভিতর দিয়ে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল।

পূর্ণ মানুষ গঠনের এই বে ছন্দাত্মক প্রকৃষ্ট প্রণালী, তাকেই ব্রতচারী-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ আবার পৃথিবীর মানুষকে শেখাবার জন্য উদ্যত হয়েছে।

এটা হ'ল প্রত্যেক মানুষের আত্মগঠনের দিক দিয়ে ব্রতচারী-পদ্ধতির মলামূল্যবান্ বৈশিষ্ট্য। এখন আমরা দেখাব যে জাতিগঠনের দিক দিয়ে এবং আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য, সাম্য, ও মৈত্রী গঠনের দিক দিয়েও ব্রতচারী-পদ্ধতীর প্রণালী সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞানসম্মত ও কার্য্যকর।

বিভিন্ন বিযুক্ত মানুষকে যদি ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করতে হয়, তবে বাইরে নানাপ্রকার সন্ধি বা মিলনপত্র স্বাক্ষর করে তা যে করা অসম্ভব, তা আজকাল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে বেশ প্রমাণিত হচ্ছে। এমন কি আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে "সমবায়" প্রণালীতে বাহ্যিকভাবে যুক্ত হয়েও মানুষে মানুষে যে বাস্তবিক আন্তরিক ঐক্য স্থাপিত হচ্ছে না, তা আজকাল বেশ বোঝা যাচ্ছে। আসল কথা এই যে, মানুষে মানুষে প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত করতে হ'লে আগে তাদের অন্তরে অন্তরে ঐক্য স্থাপিত করতে হবে,—অন্তর্মানুষে অন্তর্মানুষে ঐক্য স্থাপিত করতে হবে। এটা করার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় সমছন্দতা স্থাপন। জগৎ-সৃষ্টির মূলে এক আত্মা বিরাজ করছেন বটে, এবং সকল মানুষের মধ্যেই সেই এক আত্মারই প্রকাশ বটে, কিন্তু মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত বৈচিত্র ও বৈষম্যও স্বাভাবিক।

এই প্রকৃতিগত বৈষম্য ও বৈচিত্রকে একমাত্র ছন্দসাধনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। শতসহস্র সৈন্য যেমন সমছন্দ হস্তপদ-বিক্ষেপ-মূলক অভিযানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবকে বিদূরিত করে যুক্তশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠে, ঠিক সেই ছন্দনিয়মের প্রভাবেই শত শত মানুষ যুগপৎ সমছন্দ-সাধনার সাহায্যে ঐক্যমূলক আদর্শে অনু-প্রাণিত ও চালিত হয়ে পরস্পর বিভিন্নতা ও বিচ্ছিনতার ভাবকে দূর করে অন্তরে অন্তরে ঐক্য স্থাপিত করতে পারে।

এইজন্যই ব্রতচারী নৃত্য ও গীতের সমছন্দ-সাধনা জাতীয় ঐক্য-গঠনের পক্ষে যে নিতান্ত উপযোগী, তা সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। জাতি-স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে চাই জাতির শত সহস্র ও লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তরাত্মাকে গভীর ঐক্যসূত্রে যুক্ত করার সাধনা। ঐক্যতানের সাধনা এ বিষয়ে সবিশেষ উপযোগী ও শক্তিশালী।

একটি জাতীয় সমসাধারণ আদর্শ গ্রহণ করে জাতির প্রত্যেক

ব্যক্তির অন্তরে সেই আদর্শকে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ঠ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করাই জাতিগঠনের একটি প্রশস্ত প্রণালী। তাই ব্রতচারী সংচেষ্টায় আছে তার পঞ্চব্রতের, পণ-মানার ও প্রণিয়মের এবং তার গীতাবলীর ভিতর দিয়ে একটি সমসাধারণ জাতীয় আদর্শের অনুষ্ঠান, আর সমষ্টিগতভাবে যুগপৎ ছন্দ-সাধনার দ্বারা সেই সম-সাধারণ আদর্শটিকে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সুপ্রবিষ্ঠ ও সুপ্রতিষ্টিত করে তোলবার বিরাট ব্যবস্থা। এছাড়া জাতি-গঠন করতে হলে চাই সমসাধারণ ও নিজস্ব ভাষার ব্যবহার এবং সমসাধারণ অভিরীতির প্রতিষ্ঠা। ব্রতচারী তাই করে মাতৃভাষার অমিশ্র-ব্যবহারের সাধনা এবং সমসাধারণ অভিরীতির অনুষ্ঠান ও চর্চ্চা।

জাতি-গঠনের আর একটি প্রকৃষ্ট অপরিহার্য্য উপাদান—যে ভূমিতে জাতির উৎপত্তি সেই স্বভূমিতে সমুৎপন্ন প্রত্যেক জিনিষের এবং প্রত্যেক রীতির নীতির ও বিশেষ করে ভাবের ও ছন্দের ধারার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও সম্মান বোধ, এবং সেগুলির সযত্নে প্ররক্ষণ। যে দেশের মানুষ ভ্রান্ত প্রগতিমূলক আদর্শে বিমুগ্ধ হয়ে স্বভূমিতে উপজাত ভাবধারার ও ছন্দরূপধারার প্রতি অবজ্ঞা বা সঙ্কোচ অনুভব করে' এবং সেগুলিকে বর্জ্জন করে' অন্য ভূমির ভাব ও ছন্দধারাকে জীবনে পরিগ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়, সে জাতি প্রকৃত অন্তঃস্বরাজ ও মৌলিকতা লাভ হ'তে বঞ্চিত হয়; এবং বাহ্যিক রাষ্টিয় স্বরাজ লাভ করতে পারলেও সে জাতি তার আত্মার স্ব-ছন্দ স্ব-ধারা ও স্ব-ভাব হ'তে চ্যুত হয়ে চিরদিনের জন্য বাস্তবিকপক্ষে পরাধীন হয়ে থাকে।

তাই বাংলার মানুষকে জাতীয়তার গৌরবে গৌরবান্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলে এক জাতি করে গড়বার উদ্দেশ্যে বাংলার মানুষের স্বভূমির যে সকল ছন্দরূপের ধারা, যার মধ্যে খাঁটি বাঙ্গালী জাতির যুগ-যুগ-বাহী শৌর্য্য, অধ্যাত্মভাব ও আনন্দের

প্রধারা সুগভীর ভাবে নিহিত রয়েছে, সেগুলিকে প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট ও অনুপ্রবাহিত করে তুলবার বিশাল ব্যবস্থা ব্রতচারী পরিচেষ্টায় রয়েছে। রায়বেঁশে ও ঢালি রণনৃত্যের ও তদানুষঙ্গিক রনবাদ্যের প্রাণোন্মাদক ছন্দ-প্রধারার ভিতরে নিহিত আছে বাঙ্গালী জাতির যুগ-যুগ-বাহী শৌর্য্য-গৌরবের ইতিধারা; জারি বাউল কীর্ত্তন ইত্যাদি নৃত্যগীতের অনুপম ছন্দধারার মধ্যে নিহিত আছে বাঙ্গালী জাতির যুগ-যুগ-বাহী আধ্যাত্মিক চিত্তশুদ্ধি-সাধনার ইতিধারা; কাঠি ঝুমুর ইত্যাদি নৃত্য-গীতের এবং বাংলার মেয়েদের অনুপম ব্রত নৃত্যের ছন্দধারার মধ্যে নিহিত আছে আমাদের জাতির গতিশীল জীবন্ত বলিষ্ঠ আত্মার সহজ আনন্দ-প্রকাশের ইতিধারা। এই ছন্দোময় ইতিধারাগুলিকে জাতির জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রবাহিত করে রাখতে পারলে আমরা আবার আমাদের জাতির আত্মার ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য রক্ষা করতে এবং আমাদের জাতির আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করতে ও বর্দ্ধিত করতে পারব। বিশ্ব-মানবের আসরে বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্ট অবদান দিতে হলে এসব জাতীয় ছন্দ-সংস্কৃতিগুলিকে আমাদের সযত্নে ও সগৌরবে প্ররক্ষণ ও পরিচর্চ্চা করে রাখতে হবে—যেমন ইংলণ্ডের, স্কটল্যাণ্ডের, জার্ম্মেনীর ও রুশিয়ার নরনারীগণ তাদের জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক নৃত্যগীতের সযত্নে ও সগৌরবে প্ররক্ষণ ও পরিচর্চ্চা করে আসছে।

ইংলণ্ডের লোকনৃত্য ও লোকগীতি-প্ররক্ষণ প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক সেসিল সার্প (Cecil Sharpe) ইংলণ্ডের বিষয়ে যা বলেছেন তা বাংলার এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইংলণ্ডের তাৎকালিক শিক্ষা-পদ্ধতিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন :—

বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী অতিমাত্রায় সার্ব্বভৌমিক হয়ে পড়েছে। এই শিক্ষা-প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে

বিশ্বমানব গড়ে তোলা, ইংরেজ-মানুষ গড়ে তোলা নয়। কিন্তু আমরা চাই, ইংলিস্‌ম্যান, ইংরেজ, ইংলণ্ডের প্রেম-পূর্ণ পৌরজন। শিক্ষা-প্রণালীর এই যে দোষ, এটা কি করে নিরাকরণ করা যায়? এটা নিরাকরণ করবার উপায় হচ্ছে এই যে জাতির প্রত্যেক বালক ও প্রত্যেক বালিকাকে তার জীবনের অতি-প্রাথমিক কাল থেকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করে দিতে হবে তার স্বজাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতিগুলির সঙ্গে। স্বজাতীয় সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান হচ্ছে স্বজাতীয় ভাষা—মাতৃভাষা। স্বজাতীয় ভাষার অথবা মাতৃ-ভাষার প্রত্যেকটি কথার, প্রত্যেকটি ব্যকরণগঠিত বাক্যবিন্যাসের, প্রত্যেকটি অনুপ্রয়োগের (idiom) মধ্যে নিহিত আছে, যে জাতি সেগুলিকে গঠন করে তুলেছে এবং যে জাতির চিন্তা ও ভাব তার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, সেই জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ। একটি ইংরেজের সঙ্গে একটি ফরাসী বা জার্মেন মানুষের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ফরাসী বা জার্মেন ভাষার ঠিক সে পার্থক্য রয়েছে। আয়র্লণ্ডের স্বজাতিপ্রেমিকগণ এটা বিশেষ করে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁরা যে আইরিশ ভাষার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেছেন তা সম্পূর্ণ সমীচীন।

"ভাষা ছাড়া আছে রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবদন্তী, যেগুলি জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি; এবং তার পর হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়া, জাতীয় খেলাধূলা, এবং জাতীয় নৃত্য। এগুলির প্রত্যেকটির উপর আমাদের জাতির প্রত্যেক শিশুর একটা জন্মগত অধিকার বর্ত্তমান রয়েছে; এবং এই জন্মগত অধিকারের প্রয়োগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা এক দিকে যেমন অন্যায়, তেমনি অন্য দিকে অতি অমঙ্গলকর।

"সর্ব্বশেষে আছে, আমাদের জাতির নিজস্ব লোক সঙ্গীত—যে সহজ সরল গান ও সুরের উচ্ছ্বাস বনফুলের মতই অতি স্বাভাবিক

ও সহজ ভাবে আমাদের জাতির মানুষের প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে উঠেছে এবং যার ভিতর আমাদের জাতির চরিত্র ও ভাবধারার গভীর সন্নিবেশ রয়েছে। যদি প্রত্যেক ইংরেজ শিশু এই সব জাতীয় সংস্থৃতির সঙ্গে গভীর ভাবে সংযুক্ত হবার সুযোগ পায়, তবে সে এখনকার চেয়ে আরো বেশী করে তার স্বজাতির মানুষদের চিনতে ও বুঝতে পারবে ; এবং সেই চেনবার ও বুঝবার ফলে তাদের বেশী করে ভালবাসতে শিখবে ; এবং তাদের সঙ্গে তার আত্মার ও প্রকৃতির যে গভীর সংযোগ, তা উপলব্ধি করে সে এখনকার চেয়ে আরো বেশী পরিমাণে আদর্শ পৌরজন ও স্বদেশ-প্রেমিক হয়ে উঠবে।

"সুতরাং ইংরেজী লোকসঙ্গীতের পুনঃপ্রচলনের ফলে যাঁরা স্বদেশপ্রেমিক ও যাঁরা দেশের শিক্ষানেতা তাঁদের হাতে একটি মহামূল্যবান শক্তি এসে পড়েছে। স্বজাতির বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে স্বজাতীয় সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ কেবল যে দেশের সঙ্গীত-ধারায় প্রকর্ষ সাধন করবে তা নয়, তাতে করে স্বভূমির প্রতি এমন একটি গভীর প্রেমের এবং স্বজাতির প্রতি এমন একটি গৌরববোধের সৃষ্টি হবে যার অভাব আমরা আজকাল বিশেষ করে অনুভব করি।"

ইংরেজ মনীষী সেসিল সার্প ইংলণ্ডের তাৎকালিক শিক্ষা-প্রণালীর ও ইংলণ্ডের মানুষের সম্বন্ধে উপরোক্ত বাক্যে যা কিছু বলেছেন তার প্রত্যেকটি কথা বর্ত্তমানকালে বাংলাভূমির শিক্ষা-প্রণালীর ও মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে প্রযুজ্য। স্বজাতি-গঠন করতে হলে প্রথমত ও প্রধানত চাই স্বজাতির নিজস্ব সংস্থৃতি-ধারার সঙ্গে, বিশেষ করে নিজস্ব ছন্দ-সংস্থৃতি-ধারার সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংযোগ। "ব্যক্তি" কথাটার প্রকৃত ও গূঢ় মর্ম্মার্থ ই হচ্ছে এই যে, সে তার স্বভূমির ছন্দ-প্রধারার ব্যক্তি বা প্রকাশ। সুতরাং জাতির মানুষকে যদি তার স্বভূমির ছন্দ-সংস্থৃতি-প্রধারার 'ব্যক্তি'-

স্বরূপ করে গঠিত হবার সুযোগ ও শিক্ষা না দেওয়া হয় তবে সে প্রকৃত-পক্ষে স্বজাতীয়তা লাভ করতে পারে না,—জাতীয় স্ব-ছন্দের সঙ্গে, স্ব-ভাবের সঙ্গে, স্ব-ধারার সঙ্গে তার সংযোগ হয় না—এবং তার ফলে জাতীর গভীর অন্তরাত্মার সঙ্গে সে নিজের প্রাণের সংযোগ স্থাপন করতে পারে না।

বাংলা ভূমির সংস্কৃতিমূলক গৌরবময় ছন্দপ্রধারাবলী রায়বেঁশে, ঢালি, লাঠি, জারি, বাউল, কীর্ত্তন ও বাংলার মেয়েদের ব্রতনৃত্যের রূপে আবহমানকাল থেকে জাতির জীবনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার ভ্রান্ত আদর্শের ফলে এই জাতীয় মহাসম্পদের মহামূল্যবান ইতিধারাগুলি গত এক শতাব্দীর মধ্যেই তথাকথিত ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের দ্বারা বর্জ্জিত হয়ে নিরক্ষর ও দরিদ্র পল্লীবাসিগণ-কর্ত্তৃক সুদূর পল্লীতে পল্লীতে রক্ষিত হয়ে আসছে। এই জাতীয় সম্পদ্‌ধারাগুলিকে পুনরায় সমগ্র জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে জাতিকে শক্তিমান তেজোবান্ ও জীবন্ত করতে যে চেষ্টা ব্রতচারী প্রণালীর ভিতর * সন্নিবেশিত করা হয়েছে কেহ কেহ তাকে প্রগতির বিরোধী বলে অভিমত প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন নি। এই অভিমত যে নিতান্ত ভ্রান্তিপ্রসূত ও অজ্ঞতার পরিচায়ক, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের মত মহামনীষীর নিম্নে উদ্ধৃত অভিবাণী থেকেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। কয়েক বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ লেখককে যে চিঠি খানা লিখেছিলেন, তার থেকে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল :—

"বিদেশ থেকে ফিরে এসে আপনার আর একটি যে অধ্যবসায় দেখলুম তাতে আপনার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা বেড়েছে। দেশের স্বাস্থ্য এবং অন্নের সংস্থান খুবই জরুরি সন্দেহ নেই—কিন্তু আনন্দের প্রকাশ তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। দেশের

* ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৩৭

জনসাধারণ ব'লতে যাদের বোঝায় সেই পল্লীবাসীরা তাদের নৃত্যে গীতে কাব্যকলায় অজস্রভাবে প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করেছে। মরা নদীর মাঝে মাঝে জলকুণ্ডের মতো এখনো তার অবশেষ দেখা যায়, কিছুদিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবে এমন আশঙ্কা আছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মূঢ়তা তার অন্যতম কারণ। আমরা গ্রন্থকীট, দেশের গভীর প্রাণপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। আমরা ইংরেজি "ইস্কুল বয়"—সেইজন্যে পুঁথির নজীর অনুসরণ করে' বিদেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে পণ্ডিতী করতে আমাদের উৎসাহ, কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে জনসাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য্যপ্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরুপণ করতে পারি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নৃত্য। সরস্বতীর এই মহদ্দানকে আমাদের ভদ্রসমাজ অবজ্ঞা করে' পেশাদারের ঘরে ঠেলে দিয়েছে—জনসাধারণের মধ্যে আড়ালে আবডালে কিছু কিছু আছে সসঙ্কোচে -আপনি তাকে অখ্যাতি থেকে মুক্ত করে' সর্ব্বজনের মধ্যে তার আসন করে' দেবার চেষ্টা করছেন, এ একটা বড় কাজ। সকল রকম আনন্দের প্রকাশ মানুষের প্রাণশক্তিকে জাগরূক করে' রাখে; মানুষ কেবল অন্নের অভাবে মরে না—আনন্দের অভাবে তার পৌরুষ শুকিয়ে মারা যায়। আপনি পল্লীর পুরাতন রায়বেঁশে নাচকে নতুন আবিষ্কার করেছেন; এ রকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ। এই নাচের উৎসাহকে আপনি ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যেও সঞ্চারিত করে' দিচ্ছেন। পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকলা পৌরুষেরই সহচরী। আমাদের দেশেরও চিত্ত-দৌর্ব্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য। তাই আমি কামনা করি আপনার চেষ্টা ব্যাপক হোক সার্থক হোক।"

ব্রতচারী নৃত্যগুলির স্থান বাংলার জাতীয় জীবনে অতি উচ্চে। বাংলার জাতীয় জীবনের পুনঃসংগঠনে এদের কার্য্যকারিতা অপরিহার্য্য ও অমোঘ। কেহ কেহ ভ্রান্তিবশতঃ এ গুলির কোন

কোনটিকে সাঁওতাল নাচ বলে ভ্রম করে থাকেন। ইহাও নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। যে সকল নৃত্য ব্রতচারী পদ্ধতিতে গৃহীত হয়েছে, তার কোনটিই বাঙ্গালীর ছাড়া অন্য জাতির নয়। এদের প্রত্যেকটি আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষদের কর্ত্তৃক সংসৃষ্ট ও বহুযুগব্যাপী চর্চ্চাদ্বারা পূত। বাংলাভাষার মতই এগুলি শাশ্বত বাঙ্গালী জাতির আবহমান জীবন-সংস্থিতিধারার রূপায়িত আনন্দপ্রবাহ। জাতীয় জীবনে ও শিক্ষাপ্রণালীতে ইহাদের সযত্নে পুনঃপরিগ্রহণ ব্যতিরেকে, কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, কি সংকৃষ্টিগত ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন অসম্ভব।

বাংলার মানুষের স্ব-ধারা-সংযোগ ও স্ব-মূল-প্রতিষ্ঠা

সমগ্র জগৎ-সংসার যে অনন্ত স্পন্দনরাশির এক বিশাল ছন্দশীল অবিরাম ও অনন্ত প্রবাহ, তা ভারতের দর্শনে বহু প্রাচীন যুগ থেকে উপলব্ধ হয়ে এসেছে। আজকাল পাশ্চত্য বিজ্ঞান তার বাহ্যতান্ত্রিকতাকে ভেদ করে অবশেষে এই মহাসত্যের উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে।

সমগ্র জগতের কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি প্রথমত এই পৃথিবীর কথা ভাবি, তাহলে বুঝতে পারব যে আমাদের পৃথিবী এই অনন্ত জগৎ-সংস্থতির সৌর-জগৎরূপ একটি আংশিক প্রবাহের অংশ মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর এই সার্ব্বভৌমিক ধারা-সংস্থতিও বহু বিভিন্ন ভূমি-সংস্থতির বৈচিত্রের যোগে গঠিত। ভারতভূমি ও তার আবহমান সমষ্টি-জীবন-প্রধারা এই বিশাল বিশ্ব-সংস্থতির একটি বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যমূলক সংস্থতি-ধারা। কিন্তু এখানেই আমাদের ক্ষান্ত হলে চলবে না - কারণ তা হলে সত্যের অপলাপ ও অস্বীকৃতি করা হবে। ভারতের আবহমান বিশাল সংস্থতিধারাও অনেকগুলি বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় ভূমি-সংস্থতিধারার সংযোগে গঠিত। তার মধ্যে বাংলাভূমির সংস্থতিধারা একটি। যারা বাংলাভূমির ও বাংলার সমষ্টিজীবনের সংস্থতিধারার বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করে' এক লাফে ভারতের সংস্থতিধারার সঙ্গে যুক্ত হতে চান, তারা একটি শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার করেন বলে মহাভ্রমে পতিত হন। (আজকালকার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এই ভ্রমের বিশেষ উদাহরণ লক্ষিত হয়—এ রা বাংলাভূমির সংস্থতির-ধারার বৈশিষ্ট্যবাদকে ও বাংলা প্রেমের সংগঠন ও অনুভূতির প্রচেষ্টাকে "প্রাদেশিক", "মধ্যযুগের মনোবৃত্তি" এবং "প্রগতির পরিপন্থিতা" বলে অভিহিত করেন।)

(আমাদের মতে যথার্থ পক্ষে এঁরা মূলহীনতার এবং বাংলার স্ব-ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন, এবং বাংলার মানুষের প্রকৃত আত্ম-গঠনের ও একত্ব-গঠনের পরিপন্থিতা করেন।

ভারত একটি মহাজাতি এটা আমরা স্বীকার করি এবং সেই গৌরবময় মহাজাতির অংশ হিসাবে আমরা আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি। কিন্তু আমরা এখানে ক্ষান্ত না হয়ে বলি যে বাংলা এই ভারত মহাজাতির একটি বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যময় অংশধারা—এবং আমরা এই বাংলার সংস্কৃতিধারার প্রকাশ বা 'ব্যক্তি'।

(আজকাল) যাঁরা 'প্রগতি' 'প্রগতি' করে বেশী চীৎকার করেন, তাঁরা ইউরোপীয়দের অনুকরণে বিশ্ব-প্রকৃতির এই গভীর আভ্যন্তরীণ বিজ্ঞান-সম্মত সত্যকে উপেক্ষা করে' কেবলমাত্র একটা বাহ্যিক ঐক্য-সাধনের প্রয়াসে বাহ্যিক উপায় অবলম্বনে ব্যাপৃত হন; এবং বাঙ্গালী জাতির আত্মোপলব্ধির ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায় সাধন করেন।

সমগ্র ভূমণ্ডল একটি বিশাল ছন্দশীল স্পন্দন-প্রবাহ-ধারা, এবং তার অন্তর্গত প্রত্যেক ভূমি ও সেই ভূমির মানুষ সেই এক সুবিশাল স্পন্দন-প্রবাহ-ধারার বা সংস্কৃতির এক একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি-ধারা। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি ও তাদের জীবন এক একটি অনন্ত প্রবাহ-ধারা অথবা সংস্কৃতি-ধারা স্বরূপ। আমাদের এই যে মতবাদ, এটাকে আমরা সংক্ষেপে ভূমি-সংস্কৃতিবাদ বা ভূমি ছন্দবাদ বলে অভিহিত করতে পারি। এই মতে প্রত্যেক ভূমিগত জাতি বা ভূমি-জাতি এক একটি অনন্ত প্রবাহ-ধারা বা সংস্কৃতি-ধারা। এই গতিশীলতামূলক, ছন্দশীলতামূলক ও সংস্কৃতি-মূলক জীবন-প্রবাহের অনুভূতি যাদের হয়নি, তারা মানুষের জীবনের এবং প্রত্যেক বিভিন্ন জাতির জীবনের সত্যপ্রকৃতির অনুভব করতে অসমর্থ।

এই ভূমি-সংস্থিতিবাদের মর্ম্ম বুঝতে পারলে আমরা বুঝব যে ভারতের জীবন যেমন একটি অনন্ত প্রবাহ বা সংস্থিতির-ধারা, তেমনি আমাদের বাঙ্গালী জাতি ও আমাদের জাতীয় জীবনও বাস্তব পক্ষে একটি অনন্ত প্রবাহধারা বা সংস্থিতি-ধারা ; এবং এই প্রবাহধারা বা সংস্থিতি-ধারাকে আমাদের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারলেই এবং এই সংস্থিতি-ধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারলেই বাস্তবিক জাতীয় জীবনের সংগঠনের ও প্রগতির সূচক হবে। যতক্ষণ এই অনুভব না হবে এবং এই সংস্থিতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন না হবে, ততক্ষণ বাস্তবিক জাতীয় জীবন সংগঠনের ও জাতীয় প্রগতির সূত্রপাত হবে না।

এটা যে মধ্যযুগের মনোবৃত্তি মাত্র নয়, অথবা প্রগতির পরিপন্থী কথা নয়, তার প্রমাণ এই যে, স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর গয়া কংগ্রেসের প্রদত্ত বিখ্যাত বক্তৃতায় এই সংস্থিতিবাদ স্বীকার করে গিয়েছেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছেন :—

"আমার এই অভিমত যে, প্রত্যেক জাতি সমগ্র বিশ্ব-মানব জাতির এক একটি বিশিষ্ট প্রবাহ (সংস্থিতি)-ধারা। কিন্তু কোন জাতি যতক্ষণ তার স্বকীয় ধারাবাহী না হয়—স্ব-স্থ বা স্ব-প্রতিষ্ঠ না হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবের সঙ্গে তার একত্বের অনুভব না করে, ততক্ষণ সে তার নিজস্ব জাতিসাফল্য লাভ করতে অসমর্থ হয়। সুতরাং জাতীয় জীবন-গঠনের রহস্য নিহিত রয়েছে এই প্রবাহধারা বা সংস্থিতিধারার উপলব্ধিতে এবং এই প্রবাহের (অথবা সংস্থিতির) যে মহাপরিণতি তার সাধনাতে বদ্ধপরিকর হয়ে ব্রতী হওয়াতে। যখন থেকে তুমি সেই সংস্থিতির সন্ধান বা অনুভব লাভ করবে এবং তোমার অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতার স্থাপনা করতে পারবে, তখন থেকেই তোমার জাতীয় আত্মপ্রকাশ বা আত্মব্যক্তি আরম্ভ হবে এবং সেই মুহূর্ত্ত থেকে কোন প্রতিকূল শক্তি তোমার জাতীয়-জীবন-প্রতিষ্ঠার জয়যাত্রাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না।"*

* "I contend that each nationality constitutes a particular stream of the great unity, but no nation can fulfil itself unless it becomes itself

এই বক্তৃতায়ই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 'স্বরাজ' কথাটীর প্রকৃত অর্থ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন :—

"সুতরাং আমাদিগকে জাতীয় ভাবের জাগরণ ও প্রবর্দ্ধন করে তুলতে হবে।.....'স্বরাজ' জিনিসটা কি ?—এই প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। স্বরাজের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব এবং কোন বিশিষ্ট শাসনপ্রণালীর সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। "স্বরাজ্য" ও "সাম্রাজ্য" এ দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। স্ব-জাতীয় মনোভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকেই আমি বলি স্বরাজ।"†

সুতরাং দেশবন্ধুর উপরোদ্ধৃত মতাবলীগুলি থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে ব্রতচারীরা যে দুইটী বিশেষ মর্মকথা—অর্থাৎ স্বরাজ যে মূলতঃ ও যথার্থতঃ একটি বাহ্য রাষ্ট্রগত ব্যাপার নয়—একটি অন্তরগত জাতীয় স্ব-ভাবের অনুভূতি ও উপলব্ধি ও তার সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশ; এবং জাতীয় জীবনে যে একটি প্রবাহ বা সংস্কৃতি-ধারা এবং জাতীয় জীবনের সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হলে ও তার পরিণতি সাধন করতে হলে সেই সংস্কৃতি-ধারার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যে একান্ত প্রয়োজন—এই দুইটি মতবাদের সঙ্গে তাঁর মতের হুবহু মিল রয়েছে।

বাঙ্গালীকে জাতি হিসাবে স্ব-স্থ বা আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হলে, জাতীয় জীবনের সার্থকতা ও পরিণতি সাধন করতে হলে তার আবহমান কাল থেকে প্রবাহিত যে জাতীয় সংস্কৃতিধারা, তার স্পষ্ট অনুভূতি অন্তরের মধ্যে আনতে হবে এবং সেই সংস্কৃতি-ধারার

---

and, at the same time, realises identity with humanity. The whole problem of nationalism is therefore to find that stream and to face that destiny. If you find the current and establish a continuity with the past, then the process of self-expression has begun, and nothing can stop the growth of nationality."

† "We have therefore to foster the spirit of Nationality. A question has often been asked as to what is Swaraj. Swaraj is indefinable and is not to be confused with any particular system of Government. There is all the d fference in the world between Swarajya and Samrajya. Swaraj is the natural expression of the national mind."

সঙ্গে, সেই অনন্ত ছন্দপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে; বাঙ্গালীকে প্রকৃত 'স্বরাজ' লাভ করতে হলে বাংলার সংস্কৃতিগত 'স্ব-ভাব'কে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তার অভিব্যক্তি করতে হবে। বাংলার প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাংলার সংস্কৃতিগত 'স্ব-ভাব-এর 'ব্যক্তি' স্বরূপ হতে হবে।

ভ্রান্ত প্রগতির মোহে যাঁরা এই জাতি-সংস্কৃতি-ধারাকে, এই স্ব-ভূমির আবহমান সংস্কৃতি-ধারাকে উপেক্ষা করেন, তাঁরা বাংলার যথার্থ জাতি-গঠনের অন্তরায় সাধন করেন।

বাংলার স্ব-ধারার সঙ্গে, স্বকীয় সংস্কৃতির সঙ্গে, সংযোগের উপায় অবলম্বন না করে কেবল 'প্রগতি' 'প্রগতি' চীৎকার বা বাহ্যিক আন্দোলনে ব্যাপৃত হলে আমাদের বাস্তবিক স্বরাজ লাভ অসম্ভব। বাংলার স্ব-ধারার সঙ্গে, স্ব-ভাবের সঙ্গে, সংযুক্ত হবার প্রকৃষ্ট উপায়—বাংলার জীবনের যে ছন্দ-প্রকাশ বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে, বাংলার নৃত্যধারা ও গীতিধারার ভিতর দিয়ে রূপায়িত হয়ে এসেছে সেই রূপধারার সংস্কৃতিগুলিকে জীবনে বরণ ও গ্রহণ করা ও তাদের সাহায্যে অন্তরের মধ্যে বাংলার স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারাকে প্রবাহিত করা। অর্থাৎ সংক্ষেপে বাংলার ব্রতচারী-নৃত্য-গীতের সাদর চর্চা ও সমষ্টিগত অভ্যাস করা। এইগুলির ভিতরে জাতির জীবনের সংস্কৃতি-ধারা আবহমান কাল থেকে রূপায়িত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এগুলি বাঙ্গালী জাতির জীবন-বৃক্ষের মূলস্বরূপ। প্রত্যেক বাঙ্গালী শিশু, প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলে মেয়ে, প্রত্যেক বাঙ্গালী পুরুষ নারীকে এই সকল সংস্কৃতি-ধারাকে স্ব স্ব জীবনে প্রবাহিত করবার—এই সকল মূলসূত্রকে স্ব স্ব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে তারা স্বকীয় সংস্কৃতি-চ্যুত, ধারা-ভ্রষ্ট ও মূলহীন হয়ে পড়বে; বাঙ্গালী জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে; বাঙ্গালীর আত্মা তার প্রকৃত স্বরাজ লাভের পথ থেকে চিরভ্রষ্ট হয়ে শাশ্বত কালের জন্য পরাধীন হয়ে থাকবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে ধারাবাহিকতার উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন প্রত্যেক বাঙ্গালীকে সেই ধারাবাহিকতা সংস্থাপন ও রক্ষা করবার জন্য প্রযত্ন করতে হবে। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে বাংলার সংস্কৃতি-ধারার বাহক হতে হবে। নইলে সে তার জাতি-ধর্মের উপেক্ষা করবে।

সেই জন্যেই আমি বলেছি—

"ব্রতচারী বাংলার ধারাবহ বিন্দু,
ধারা প্রবাহিত রেখে চলে যাবে সিন্ধু।"

আবহমান নদীর জলবিন্দুগুলির মতই প্রত্যেক বাঙ্গালীকে বাংলার মহাপ্রবাহের সংস্কৃতি-নদীর ধারাবহ বিন্দু স্বরূপ হতে হবে এবং সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ ও প্রবাহিত রেখে অনন্ত জীবনে মিলিত হওয়াতেই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি ও সার্থকতা সাধন হবে।

বাংলার জাতীয় নৃত্যগুলি বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিক সূত্র স্বরূপ। এগুলিকে প্রাদেশিকতার বা মধ্যযুগের মনোবৃত্তির বাহক বলে অথবা কেবলমাত্র ছোটলোকের বা অশিক্ষিত লোকের চর্চার যোগ্য বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা জাতীয় জীবন-সংগঠনের প্রকৃত প্রণালী সম্বন্ধে মোহান্ধতা প্রকাশ করেন মাত্র। এগুলিকে যাঁরা সাঁওতাল নৃত্য বলে ভ্রান্তি করেন, তাঁরাও নিরতিশয় অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এর প্রত্যেকটী অতি সযত্নে বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবলী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাভূমির বীর্য্য-সংস্কারের সঙ্গে বাঙ্গালীর মূল সংযোগ

মানুষের জাতীয় জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের নিয়মের অনেকটা অনুরূপতা আছে নদীর জীবনের এবং বৃক্ষের জীবনের সঙ্গে। তার কারণ, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানে জীবনের প্রকাশ, সেখানেই একটী মূলীভূত নিয়মের অনুবর্ত্তিতা দ্বারা সৃষ্টির অদ্বৈততা প্রকাশ পায়। নদীর জীবনে সৃষ্টিগত নিয়ম দেখা যায় যে, নদীর বিন্দুগুলির ততক্ষণই জীবন্ত নদীত্বের ধর্ম থাকে, যতক্ষণ তাদের সঙ্গে নদীর উৎপত্তির উৎসের অবিচ্ছিন্ন ধারা-বাহিক সংযোগ থাকে। আবার বৃক্ষের বেলায় আমরা দেখতে পাই যে, বৃক্ষ ততক্ষণই জীবন্ত থাকে যতক্ষন তার স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মূলের সঙ্গে তার সংযোগ থাকে! মানুষের জীবনের সঙ্গে এগুলির একমাত্র তফাৎ এই যে, মানুষ স্থাবর না হয়ে জঙ্গম; তাই তার উৎপত্তির উৎসের সঙ্গে এবং তার আত্মার মূলের সঙ্গে তার যে সংযোগ তা বাহ্যিক জড়পদার্থমূলক সংযোগ নয়। কিন্তু এই পার্থক্য সত্বেও সৃষ্টির মূলীভূত যে নিয়মের কথা আমরা বলেছি, মানুষের সে নিয়ম এড়িয়ে চলা অসম্ভব। তবে কিনা, মানুষের বেলা উৎপত্তি-উৎসের সঙ্গে অথবা অন্তর্জীবনের মূলের সঙ্গে যে সংযোগ, সেটা বাহ্যিক না হয়ে আধ্যাত্মিক। সংযোগ কিন্তু তাকে রাখতেই হবে। সেই সংযোগ যদি সে না রাখে, তা হলে তার জড়-জীবনে সে জীবিত থাকৃতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্ম-জীবনে তার মৃত্যু হয়। এখানে আমাদের বিশেষ করে বুঝতে হবে যে, উদ্ভিদ্-জীবনের ও পশু-জীবনের অথবা ইতর-প্রাণি-জীবনের সঙ্গে মানুষের জীবনের তফাৎ এই যে, মানুষ দুই লোকে বাস করে —একটা জড়-লোক এবং একটা অধ্যাত্মলোক। অধ্যাত্ম-জীবনে মৃত হয়ে সে জড়-জীবনে জীবিত থাকৃতে পারে; আবার স্বাস্থ্যের

অনুপাতে যেমন জড়-জীবনে জীবিত থাকার পরিমাণের তারতম্য হয়, তেমনি অধ্যাত্ম-জীবনের উৎসের অথবা মূলের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সংযোগের তারতম্যের অনুপাতে অধ্যাত্ম-জীবনে জীবিত থাক্‌বার পরিমাণেরও তারতম্য হয়।

মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের উৎস ও মূলের দুটো কোঠা আছে। একটা আত্মার কোঠা, আর একটা ভূমির কোঠা। অর্থাৎ আত্মার ভাব ও আদর্শ, এবং ভূমিজাত সংস্কার এই দুটোর ঘনিষ্ঠ সংযোগে মানুষের জীবনের পূর্ণ-পরিণতি। অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে ভূমি-সংস্কারকে অস্বীকার করে' বিশ্বমানবতা লাভ কেবলমাত্র অতি-মানব অথবা মহাত্মাদের বেলা চলে; সাধারণ মানুষের বেলায় তা অসম্ভব। আবার কেবল ভূমি-সংস্কারে উপর নির্ভর করে' আত্মার আদর্শ থেকে চ্যুত হ'লে মানুষ যে জীবনের মহত্ত্ব লাভ করতে পারে না, তা বলা বাহুল্য। এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা যে বড় এবং কোন্‌টা ছোট তা বলা কঠিন। কারণ পুরুষ-প্রকৃতি-পরিকল্পনার মত আত্মার ভাব ও ভূমির সংস্কার একে অন্যের উপর এত ওতপ্রোতভাবে নির্ভর করে যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটিকে অতিক্রম করে অন্যের প্রকাশ অসম্ভব।

এজন্য পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠন করতে হ'লে দুটো জিনিষের দরকার। একটি হচ্ছে জীবনে মহৎ অধ্যাত্ম-আদর্শের প্রবর্ত্তন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভূমি-সংস্কারের অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে ধারাবাহিক সংযোগ।

বাঙ্গালীকে আমরা বীরের জাত করতে চাই। খালি আদর্শবাদের দ্বারা অর্থাৎ রাজপুতনার গল্প কি গ্রীক বীরদের গল্প কি রোমান বীরদের গল্প কি সুইস বীর উইলিয়াম টেলের গল্প—যার ছড়াছড়ি আমাদের পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায়—এগুলির সাহায্যে বাঙ্গালীর আত্মার বীরভাবকে জাগাবার যে প্রচেষ্টা, তা নিষ্ফল হ'তে বাধ্য; তার কারণ এদের সঙ্গে বাঙ্গালী অধ্যাত্ম-সংযোগ থাকা সত্ত্বেও ভূমি-সংস্কারের সংযোগ নেই। এদের

বীরত্ব-ধারার সংস্কার এদের আপন আপন ভূমি-প্রকৃতিতে প্রবহমান হ'য়ে আসছে। এগুলির বাহ্যিক অনুপ্রেরণা দ্বারা বাঙ্গালী জাতির সাহায্য তেমনি ভাবে এবং ততটুকুই হ'তে পারে, যতটুকু বাইরের আলো এবং হাওয়ার স্পর্শে একটা বৃক্ষের জীবনে হয়। কিন্তু বৃক্ষের জীবনের বৃদ্ধি যেমন প্রথম এবং প্রধানভাবে নির্ভর করে, তার মূলের ভিতর দিয়ে আহৃত নিজস্ব ভূমি-সংস্কারের উপর তেমনি বাঙ্গালীর জীবনে বীরত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রধান উপায় তার ভূমি-সংস্কারের মধ্যে তার বীরধর্ম্মের সংস্কাররূপ যে মূলগুলি জীবন্ত আছে, তার সঙ্গে প্রত্যেক বাঙ্গালীর জীবনের ধারাবাহিক সংযোগ করিয়ে দেওয়া। নদীর উৎপত্তির উৎসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সংযোগের এবং বৃক্ষের স্ব-মূলের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সংযোগের যে উদাহরণ দিয়েছি, বিশ্বসৃষ্টির ঠিক সেই নিয়মেরই এটি আর একটা দৃষ্টান্ত।

বীরধর্ম্মের ক্ষেত্রে ভূমি-সংস্কারের গৌরবের দিক থেকে বাঙ্গালীর কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। এই ভূমি-সংস্কারের প্রবাহধারাকে আমাদের জীবনে আন্‌তে হবে—জাতির ইতিহাসের কাহিনীর ভিতর দিয়ে এবং জাতির জীবনে অবিরাম প্রবাহিত বীররসের জীবন্তধারার ছন্দরূপ থেকে। বাঙ্গালী জাতির কাপুরুষতার অপবাদের সংস্কার আমাদের মনের মধ্যে যে গভীর অধিকার স্থাপন করেছে, আমাদের অন্তশ্চৈতন্যের গভীর মর্মদেশ থেকে তার মূলোচ্ছেদ করে', প্রত্যেক বাঙ্গালী পুরুষ ও নারীর—বিশেষ করে' প্রত্যেক বাঙ্গালী শিশুর ভূমিষ্ঠ হ'বার মুহূর্ত্ত থেকে এমন কি তার মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময় থেকে বাঙ্গালীর স্বভূমিজাত বীরত্বের সংস্কার তাদের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট করে দিতে হবে।

আমাদের পরম সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি আমাদের জাতির ইতিহাসের ক্ষেত্রে এবং স্বভূমির ছন্দধারার ক্ষেত্রে গবেষণার ফলে যে সব মূল্যবান্ আবিষ্কার হয়েছে, তার সাহায্যে বাঙ্গালী জাতির

জীবনে আমরা যে আমাদের স্বভূমিজাত বীরত্বের গৌরবময় সংস্কার পুনর্ব্বার গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট ও অধিষ্ঠিত করাতে পারব, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের এখন থেকে বিশ্বাস করতে হবে যে, কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে নয়, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালী অতীতযুগে একটি শ্রেষ্ঠ বীরের জাতি ছিল। ইহা কেবল অলীক কল্পনাপ্রসূত নয়, এর দ্বিবিধ অকাট্য প্রমাণ আমরা পাই - একদিকে গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকের কাহিনীতে এবং অন্য দিকে রায়বেঁশে ও ঢালির বীর-নৃত্যের যুগ-বাহী জীবন্ত অস্তিত্ব থেকে। আমাদের অতীত ইতিহাসের কয়েকটি বিশেষ কাহিনী আমাদের প্রত্যেকের মনের ভিতরে ও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট করে আমাদের জাতির জীবনের বীরত্ব-ধারার মূলের সঙ্গে সংযোগ করে নিতে হবে। এর প্রথমটি হচ্ছে গঙ্গারাঢ় যুগে আমাদের জাতির অনুপম বীরপনার কাহিনী।

পুরুরাজ সেকেন্দারের কাছে পরাজিত হয়েও যে আত্মসম্মান দেখিয়েছিলেন ও সেকেন্দর কর্ত্তৃক যেরূপ প্রশংসিত ও সম্মানিত হয়েছিলেন, তার গৌরবময় কাহিনী আমাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুলের পুস্তকে পড়ে থাকে। এটা সমগ্র ভারতের পক্ষে একটি গৌরবময় ঘটনা। কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে এর চেয়ে বেশী গৌরবময় যে কাহিনী, তা বাঙ্গালীর স্কুলপাঠ্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে না, তা বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে জানতে পায় না। সেই কাহিনী নিম্নে দেওয়া হল :—

গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমি (Ptolemy) তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাসে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহাপ্রতাপশালী গঙ্গারাঢ় জাতির বীর্য্যকাহিনীর বর্ণনা করে গেছেন। তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ স্থানীয় এই জাতিকে বর্ণনা করে গেছেন—"গঙ্গারিডী" (Gangaridae) নামে। কবি সত্যেন্দ্র দত্ত তাঁর কবিতায় এই নামের 'গঙ্গাহৃদি' রূপ দিয়েছেন। কিন্তু আমি যখন ১৩৩৮ সালে রায়বেঁশের আবিষ্কার করি, তখন সেই প্রসঙ্গে টলেমির এই ইতিহাসের উল্লেখ করে আমি এই

"গঙ্গারিডী" নামটা "গঙ্গারাঢ়" নামের অপভ্রংশ বলে সর্ব্বপ্রথমে অনুমান করি এবং এ বিষয়ে তখন নিম্নলিখিত যুক্তি উথাপিত করি :—

"রাঢ় দেশের পশ্চিম সীমান্তেই খাঁটি রায়বেঁশে শ্রেণীর অমিত পরাক্রম যোদ্ধাদের অতি প্রাচীনকাল হইতেই বসতি ছিল। ইহা হইতে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, গঙ্গারাট বা গঙ্গারাঢ় প্রদেশের ভারতীয় যোদ্ধাদের অতুল পরাক্রমের কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের সৈন্যদল পূর্ব ভারতে অগ্রসর হইতে অস্বীকার করে এবং ইহার ফলে সেকেন্দরকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, এই গঙ্গারাঢ়ী সেনাদল সেই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিল। গঙ্গারাঢ় প্রদেশে যে আধুনিক রাঢ় প্রদেশ, ইহা বিদেশী পর্য্যটক মেগাস্থিনিস ও টলেমির গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রমাণাদি হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে এবং এই গঙ্গারাঢ় নাম হইতে খুব সম্ভবতঃ আধুনিক রাঢ় নামের উৎপত্তি।"

আমার উপরোক্ত প্রবন্ধে প্রবর্ত্তিত এই গঙ্গারাঢ় নাম পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে গৃহীত হয়েছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর প্রণীত 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে সম্প্রতি এই গঙ্গারাঢ় নাম প্রয়োগ করেছেন এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর 'বঙ্গ-পরিচয়' নামক পুস্তকে এই নাম গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন।

ঐতিহাসিক ম্যাকক্রিণ্ডল টলেমির ইতিহাসের উল্লেখ করে আমাদের গৌরবময় শৌর্য্যশালী পূর্ব্বপুরুষ গঙ্গারাঢ়ীদের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখেছেন :—

"এই মহাপ্রতাপশালী জাতি (গঙ্গারাঢ়ীগণ) গঙ্গানদীর মোহনাস্থিত সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে বাস করত। তাদের রাজধানী ছিল গাঙ্গী ইহাকে পেরিপ্লাস গ্রন্থে গঙ্গাতীরবর্তী একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রোমক কবি ভার্জ্জিল (Virgil)

তাঁর 'Georgic' নামক কাব্যে এদের বীরত্ব-কাহিনীর বর্ণনা করেছেন, এবং রোমক ঐতিহাসিক ভ্যালেরিয়াস ফ্লেকাস (Valerius Flaccus) ও কার্টিয়াস (Curtius) এদের উল্লেখ করেছেন ও এদের বসতি গঙ্গানদীর পূর্ব্বতটে নির্দ্দেশ করে গেছেন। ঐতিহাসিক প্লিনী (Pliny) এদের নাম দিয়েছেন 'গঙ্গারাঢ়ী কলিঙ্গী' এবং গাঙ্গেয় প্রদেশের দূরতম সীমান্তে এদের বসতি উল্লেখ করে গিয়েছেন।

"এই জাতি নিশ্চয়ই পরম প্রতাপশালী ছিল, তা বোঝা যায় প্লিনীর বর্ণিত তাদের সৈন্যদলের পরিমাণ থেকে। প্লিনী আরও বলেছেন যে এরা কেবলমাত্র সুন্দরবনের জলা-জমিতে আবদ্ধ ছিল না; বর্ত্তমান বাংলা প্রদেশের অনেকটা জায়গায় তারা বাস করত। এবং প্লিনী যে রাজধানীর নাম 'পার্থলিস' উল্লেখ করেছেন তা নিশ্চয়ই 'বর্দ্ধন'—যা অতীত যুগে একটি সমৃদ্ধশালী নগর ছিল এবং যার বর্ত্তমান নাম 'বর্দ্ধমান'।"*

---

* "Gangaridai ;—This great people occupied all the country about the mouths of the Ganges. Their capital was Gange, described in the Periplus as an important seat of commerce on the Ganges. They are mentioned by virgil (Geogr III, 1. 27), by Valerius Flaccus, (Argon lib. VI, 1-66), and by Curtius (lib. IX, c,ii) who places them along with the Pharrasii (Prassii) on the eastern bank of the Ganges. They are called by Pliny (lib, VI. C IXV) the Gangaridae Calingae, and placed by him at the furthest eztremity of the Ganges region as is indicated by the expression 'gen novissima', which he applies to them. They must have been a powerful people, to judge from the military force which Pliny reports them to have maintained, and their territory could scarcely have been restricted to the marshy jungles at the mouth of the river now known as the Sundarbans, but must have comprised a considerable portion of the Province of Bengal. This is the view taken by Saint Martin. Bengal, he says, represents at least in a general way, the country of the Gangaridae and the city which Pliny speaks of as their capital, Parthalis can only be Vardhana, a place which flourished in ancient times, and is now known as Burdhwan."

Mc Crindle's Ancient India, as described by Ptolemy pages 173—174.

এফ্, জে, মোনাহান (F. J. Monahan) তাঁর প্রণীত বাংলার আদিম ইতিহাস (Early History of Bengal) গ্রন্থে লিখেছেন :—"প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক ডিওডোরাস (Diodorus)-এর মতে ভারতবর্ষে অনেক প্রতাপশালী জাতি ছিল, কিন্তু তার মধ্যে সব চেয়ে পরাক্রান্ত জাতি ছিল গঙ্গারাঢ়ী—যাদের হস্তী-বাহিনীর বিপুলতার সংবাদে সেকেন্দর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-অভিযান করতে ক্ষান্ত হন। এই গঙ্গারাঢ় দেশ ভারতের অন্তিম পূর্ব্ব দেশ থেকে এই অঞ্চলের সব চেয়ে বৃহৎ নদী দ্বারা বিযুক্ত ছিল।

"ডিওডোরাস, কুইন্টাস কার্টিয়াস (Quintus Curtius) ও প্লুটার্কের (Plutarch) কাহিনী পাঠে মনে সন্দেহ থাকে না যে সেকেন্দরের ভারত আক্রমণের সময় উত্তর ভারতে সব চেয়ে প্রতাপান্বিত ছ'টি জাতি ছিল—অর্থাৎ প্রাশী ও গঙ্গারাঢ়ী এবং এদের আবাসভূমি ছিল গঙ্গার নিম্নপ্রদেশে যা বর্ত্তমান বাংলা অঞ্চল।"

কার্টিয়াস (Quintus Curtius) তার উল্লিখিত সেকেন্দরের ইতিহাসে টলেমির (Ptolemy) ও ডিওডোরাসের (Diodorus) প্রাচীন ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন :—

"সেকেন্দর অবগত হলেন যে সেই (শতদ্রু) নদীর পূর্ব্বে বহু বিস্তৃত মরুভূমি আছে, যা পার হতে এগার দিন লাগবে। তারপরে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী—গঙ্গা। গঙ্গার অপর পারে ছুটি জাতি বসতি করে—তাদের নাম গঙ্গারিডী (গঙ্গারাঢ়ী) ও প্রাশী। তাদের রাজা 'অর্গম্মে'র দেশ রক্ষার জন্য ২০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ২ লক্ষ পদাতিক সৈন্য ও ২০০০ চতুরশ্ব রথ তো আছেই, তা ছাড়া এদের চেয়েও ভীষণ তিন সহস্র হস্তীবাহন একটি মহতী বাহিনী আছে।

"ইহা শ্রবণ করে সেকেন্দর তাঁর সৈন্যগণকে আহ্বান করে এই গঙ্গারাঢ়ী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করবার জন্য একটি

যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। কিন্তু তাঁর ম্যাসিডোনিয়াবাসী সৈন্যদল কোন ক্রমেই তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁকে এই অভিযান হতে বিরত হতে হল।"*

এই বিশ্বজয়ী মহাপরাক্রান্ত গঙ্গারাঢ় জাতির বংশধর আমরা বাঙ্গালী। এই জ্ঞান ও এই অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় আমাদের জাতির প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর, প্রত্যেক পিতা ও মাতার, প্রত্যেক বালক ও বালিকার এবং প্রত্যেক নবজাত শিশুর অন্তরের গভীর মর্ম্মদেশের সংস্কারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে দিতে হবে, যাতে করে এই মহা-গৌরবময় ভূমি-সংস্কারের ছন্দ ও প্রেরণার ঢেউ আমাদের জাতির প্রত্যেকের চিত্তে আজন্মকাল অনুস্পন্দিত হয়ে আমাদের জাতির আত্মার বীরভাবের অবিচ্ছিন্ন যুগযুগবাহী প্রবাহধারাকে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রবাহিত করে রাখতে পারে ও আমাদের জাতির মহোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পরিণতির পথে প্রতিনিয়ত চালিত করতে পারে।

প্রত্যেক বাঙ্গালী যেন প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করে :—

"গঙ্গারাঢ় পালরাজার বীর্য্যগরিমা—
চণ্ডীদাস জয়দেবের ছন্দভঙ্গিমা

---

* "He (Alexander), learnt that beyond the river lay extensive deserts which it would take eleven days to traverse. Next came the Ganges, the largest river in all India, the farther bank of which was inhabited by two nations, the Gangaridae and the Prasii whose king Argammes kept in the field for guarding the approaches to his country 20,000 cavalry and 2,00,000 infantry, besides 2,000 four-horsed chariots, and what was the most formidable force of all, a troop of elephants which he said ran up to the number of 3000.

"He (Alexander) gathered them (his soldiers) all together and in a well weighed speech addressed the assembly on the subject of the expedition against the Gangaridae; but when the Macedonians would by no means assent to his proposal, he renounced his contemplated enterprise." (History of Alexander the Great by Q, Curtius Rufus)

হোসেন শার ঈশাখাঁর শক্তি-মহিমা
ঢেউ তাদের দেয় মোদের চিত্তে অবিরল
বাংলা মার দুর্নিবার আমরা তরুণ দল !"*

তবেই আমরা আবার জাতীয় জীবনে এক সুগভীর ঐক্যধারায় সম্মিলিত হয়ে আমাদের জাতীয় জয়-যাত্রার পথে অবিচল পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হতে পারব।

* গ্রন্থকারের রচিত "তরুণ দল" গান হইতে উদ্ধৃত।

ভারতের আত্মার পুনরুজ্জীবনে ব্রতচারীর দান

কোন জাতির আত্মার খাঁটি স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায় তার মুষ্টিমেয় তথাকথিত শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজের প্রচলিত কৃত্রিম ও মিশ্র জীবন-ধারা ও কলাপদ্ধতিতে নয়,—সেটা পাওয়া যায় জাতির সাধারণ জনগণের মধ্যে, যাদের জীবন-পদ্ধতি জাতির শাশ্বত জীবনপ্রবাহের সংস্কৃতির ধারাকে অতিক্রম করে নিত্য নূতন বিজাতীয় ধারার অনুকরণে ব্যস্ত নয়। সুতরাং জাতির স্বধর্ম্মের, স্বভাবের ও স্বধারার প্রকৃত সন্ধান পেতে হলে সাধারণ জনগণের মধ্যে যে কলাপদ্ধতি ও জীবন-পদ্ধতি ধারাবাহিক ভাবে বহমান হয়ে আসছে, তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে এবং জাতির শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই জীবন্ত ধারাগুলিকে শ্রদ্ধাভরে বরণ করে নিয়ে সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে সংগ্রামের দিকের চেয়ে জাতি-গঠনের পক্ষে জাতির আত্মার ধারাবাহিক সংরক্ষণের মূল্য কোন অংশে যে কম নয়, এটা যদি আমরা আজ না বুঝি, তা হলে রাষ্ট্রীয় মুক্তিলাভও জাতির আত্মার গৌরবের ও স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। এ কথাটি বার বার আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আজকালকার স্কুল-কলেজের তথাকথিত শিক্ষাকে যে শ্রদ্ধার আসনে আমরা বসিয়েছি ও প্রাচীন ভারতের কলার প্রাচীন যুগের মৃত রূপের অনুকরণের যে প্রচেষ্টাকে আমরা সংস্কৃতির নামে আদর দিচ্ছি, তার চাইতে বেশি মূল্য ও বেশি আদর প্রাপ্য সেই সব কলা-পদ্ধতির, যেগুলো জাতির নিরক্ষর জনগণের মধ্যে জাতির আত্মার স্বধর্ম্মের জীবন্ত প্রবাহরূপে ধারাবাহিক-ভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। এগুলিকে অস্পৃশ্যতার শ্রেণী থেকে তুলে শিক্ষার উচ্চাসনে বসাবার সময় এখন এসেছে। যাকে আমরা বাংলার লোকনৃত্য বলে অনুকম্পার চোখে দেখি, এবং তথাকথিত প্রাচ্য

নৃত্য থেকে যার স্থান বহু নিম্নে নির্দ্ধারণ করি, তার স্থান হওয়া উচিত জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে উচ্চে। এটা যে কেবল আমাদের কল্পিত অভিমত নয়, তার প্রমাণ এই যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে এই কথাটা স্বীকার করছেন। পাশ্চাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদ্ ষ্টান্‌লি হল নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন—

"প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠ লোকনৃত্যগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কি মূল্যবান্ রত্নস্বরূপ এবং কি সুগভীর অর্থে পূর্ণ তা খুব কম লোকেই বুঝতে পারেন। এই লোকনৃত্যগুলি যে কেবল স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম বা আমোদ-প্রণালী হিসাবে মূল্যবান, তা নয়। এ গুলি জাতির নৈতিক, সামাজিক ও সৌন্দর্য্যশক্তির স্বরূপ এবং জাতির পুরুষানুক্রমিক ভাবধারার ও চরিত্রধারার নিবিড় অভিব্যক্তি। এগুলি জাতির বহু যুগের পুরাতন জীবনবৃক্ষের মূলস্বরূপ এবং এই মূলগুলির সাহায্যেই জাতির বর্ত্তমান মানুষ তার যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়ের কাহিনীর ও বীরপণার সঙ্গে সংযোগ লাভ করে, যাতে করে জাতির জীবনধারা ও চরিত্রধারা গঠিত হয়ে এসেছে। এগুলি বহু শতাব্দী ধরে ক্রমবৃদ্ধি পেয়েছে; এবং জাতির জীবনের সঙ্গে এগুলি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে জাতির আত্মার ছাঁচে গড়ে উঠেছে এবং সেই আত্মার স্বরূপকে প্রকাশ করেছে। এগুলির মধ্যে নিহিত আছে জাতির যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা—এগুলি একদিকে যেমন জাতির জীবনের অভিব্যক্তি-স্বরূপ বিকশিত হয়ে উঠেছে, তেমনি আবার জাতির জীবনকে অনুপ্রাণিত ও গঠিত করেছে।

"সেইজন্য লোকনৃত্যের চর্চ্চা জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এনে দেয় স্বাস্থ্যকর ভাব ও চিন্তা, জাতির জীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে এবং জাতির জীবন-আবেষ্টনীর মধ্যে তার যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করে দেয় এবং তাকে তার জাতীয় সম্পদের অধিকারী করে দেয়।

"এগুলির চর্চ্চা জাতির আত্মার যথার্থ পুনরুজ্জীবন এনে দিচ্ছে এবং তার আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে দিচ্ছে। এগুলির চর্চ্চার সাহায্যে জাতির ব্যক্তিদের মধ্যে একটা ঐক্যের ভাব সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের অতীতকে শ্রদ্ধা করতে শেখাচ্ছে এবং জাতির যে নিজস্ব অবদান একটি আছে, সেই চেতনা এনে দিচ্ছে।" *

সুতরাং বাংলার যে সব জীবন্ত লোকনৃত্য-ধারার প্ররক্ষণ ও বহুল প্রচলনের চেষ্টা ব্রতচারী-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে আজ হচ্ছে, বাঙ্গালী জাতির আত্মার স্বধর্ম্মের ও স্বরূপের সঙ্গে জাতির শিক্ষিত সমাজের পরিচয় লাভের দিক থেকে এগুলির মূল্য যে কত উচ্চ, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি আমাদের দেশে খুব কম লোকের মধ্যেই এসেছে। সেই স্পষ্ট উপলব্ধি যেদিন হবে, সেই দিনই বাঙ্গালীর জাতীয় আত্মবিস্মৃতির অবসান হবে। সেইদিন থেকেই বাঙ্গালী আবার জাতীয় জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হবে ; এই মহামূল্য জাতীয় ধারাগুলির গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে তার ছন্দের গভীর ঐক্য-

---

* "Few understand what pedagogical gems the best folk dances are or with what condensed meanings they are freighted.

"They are not merely wholesome exercise or amusement, but *moral, social* and *æsthetic* forces, condensed expressions of ancestral and racial traits.

"They are story roots, ages old, that connect modern man with the times, facts, and heroes that made his nation and shaped his character.

"They grew up very slowly through centuries and perhaps millenia, until they have *come to fit and express the very soul* of the people, embodying its memories, expressing its *psychophysic traits*, aspirations, etc.

"Hence they give to the individual wholesome feelings and ideas and weld him to his race, place, him in the proper setting to it and endow him with his heritage and integrate him with it.

"Their conservance and practice has brought with it a genuine revival of racial spirit and racial self-respect. The members of these racial communities have by this means come to feel their own solidarity, to revere their own past and to feel that they have something of worth to contribute." (Stanley Hall—"Educational Problem").

বিধায়িনী শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিমান হয়ে সগর্ব্বে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে।

বাংলার ব্রতচারী সংচেষ্টা যে সামান্য প্রাদেশিকতার আদর্শে গঠিত নয়, দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতার নিম্নোক্ত* অভিমতটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতের জাতিগঠন-ক্ষেত্রে এত

---

*দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতা স্যার আকবর হায়দরী ব্রতচারীর নৃত্যকলা দেখে বলেছেন—

"ভারতের জনগণকে এক মহা ঐক্যে সংযুক্ত করে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির শ্রদ্ধা অর্জ্জন করার জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, তার সমস্তই আমি এই ব্রতচারী পরিচেষ্টার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।"

স্যার আকবর হায়দরী আরও বলেছেন, "ব্রতচারী প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে আজ বাংলা যা করছে তাতে করে ভারতীয় মানুষের শরীর ও মনের বৃদ্ধি এমন প্রকৃষ্টভাবে সাধিত হবে যে তার ফলে ভারতে একটা স্থায়ী নবজীবনের প্রবর্ত্তন হবে।" এর কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "ব্রতচারী পরিচেষ্টার উদ্ভব হয়েছে ভারতের গ্রামের মানুষের জীবনে আদিম যুগ থেকে জাতির জীবনের যে সব ধারা জীবন্তভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে, সেগুলি থেকে: এবং এগুলিকে কি ভাবে জাতির জীবনে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করে জাতির মানসিক আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিগত জীবনকে ভারতের চিরাগত মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিগত জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে, তা-ই ব্রতচারী পরিচেষ্টা আমাদিগকে শিখিয়ে দিচ্ছে।" তিনি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা প্রকাশ করে গেছেন যে, "এই ব্রতচারী পরিচেষ্টা ক্রমবৃদ্ধি পেয়ে এমনভাবে সমগ্র ভারতময় পরিব্যাপ্ত হবে যাতে করে পাঁচশ' বছর পরে আমাদের বংশধরগণ এর পূর্ণ ফল উপভোগ করতে পারবে এবং সমগ্র ভারতের মানুষ একমন একপ্রাণ হয়ে এক মহা ঐক্যশালী জাতিতে পরিণত হবে, যার জন্য আমাদের সকলের মনে আজ আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগছে।"

বড় প্রশংসা ব্রতচারী কেন অর্জ্জন করতে পেরেছে, এ বিষয়ে ধীর ভাবে ভাবলে আমরা বুঝতে পারব যে এর মূলে আছে ছুটি কথা। প্রথমত, ব্রতচারী আদর্শ প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতের, গভীর আধ্যাত্মিক স্ব-ভাবের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বমানবের আত্মার প্রকৃতিগত যে আদর্শ প্রাচ্য ভূমিতে, বিশেষতঃ ভারত-ভূমিতে, অতি প্রাচীন কাল থেকে অনুভূত ও পরিকীর্ত্তিত হয়েছে, ব্রতচারী প্রচেষ্টা সেই পঞ্চমুখী জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দমূলক আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আর দ্বিতীয়ত, উপরোক্ত সার্ব্ব-ভৌমিক আদর্শের সঙ্গে ব্রতচারীতে সংযুক্ত আছে স্বভূমির জীবন্ত স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারামূলক সংস্থতির অনুসরণ। এই দ্বিতীয় উপাদানের মধ্যে ব্রতচারীর জাতিগঠনের বিশিষ্ট শক্তি নিহিত আছে। বাংলার রায়বেঁশে, ঢালি, জারি ও কীর্ত্তন ইত্যাদি ছন্দরূপ দেখে স্যার আকবর হায়দরী এগুলোকে প্রাদেশিকতার রূপ মনে করেননি, কারণ তাঁর বিচক্ষণ বুদ্ধির দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এগুলি বাংলার জীবন-প্রবাহের জীবন্ত জাগ্রত ছন্দরূপ ; এগুলিতে বাংলার আত্মার অকৃত্রিম, ভেজালবিহীন, অভিনয়বিহীন স্ব-ভাষার স্ব-ধর্ম্মের ও স্ব-রূপের অভিব্যক্তি হচ্ছে এবং এগুলি বাংলাকে তার জাতীয় জীবন-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছে, এবং তাতে করে জাতি-গঠনের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সহায়তা করছে। এই সেই প্রণালী, যার কথা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জাতীয় জীবন-প্রবাহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন প্রস্তাব উপলক্ষে তাঁর গয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলে গেছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে বাংলার প্রাচীন লোকনৃত্য ও ছন্দধারার ভেতর দিয়ে সমগ্র ভারতে ঐক্য স্থাপন হবে কেমন করে? এর উত্তর হচ্ছে এই, বাংলা ভারতেরই একটি অংশ ও অঙ্গ। বাংলার জীবন-প্রবাহ ভারতের জীবনের মহাপ্রবাহের অঙ্গীভূত প্রবাহগুলির মধ্যে অন্যতম। বাংলাভূমির বৈশিষ্ট্য এই যে, কি চিত্রে, কি নৃত্যে

কি অন্যান্য কলাবিদ্যায় বাংলার জীবন বিজাতীয় অথবা কৃত্রিম প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে একটা সৌখিন বা মজলিসি রূপ ধারণ করে নি। বাংলার গ্রামে গ্রামে বাংলার যে নিজস্ব ভাবধারা ও ছন্দধারা যুগ-যুগান্তর থেকে ধারাবাহিক জীবন্ত প্রবাহে সংরক্ষিত ও অনুসৃত হয়ে আসছে, ভারতের অন্য কোথাও প্রাচীন ভারতের নিজস্ব ছন্দধারা ও ভাবধারা এরূপ অকৃত্রিম, অমিশ্র ও জীবন্তভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসে নি। সেই জন্যই কি কাব্যে অর্থাৎ ভাষায়, কি চিত্রে, কি সঙ্গীতে কি নৃত্যে বর্ত্তমান ভারতে সংস্কৃতিগত যা কিছু নবজীবনোদ্গম হয়েছে, তার উৎস বাংলার মানুষের জীবন-প্রতিভা হতে হয়েছে। স্যর আকবর হায়দরী এই কথাই স্বীকার করে গেছেন এবং ব্রতচারী সম্বন্ধে তিনি যা বলে গেছেন তার থেকে এবং সম্প্রতি হায়দরাবাদ রাজ্যের সরকারী দরবার থেকে বাংলার ব্রতচারী দলের হায়দরাবাদ-অভিযানের যে সাদর আমন্ত্রণ এসেছে, তার থেকে আমরা এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি যে ভারতের জীবনের নবজাগরণের অনুপ্রেরণা আসবে বাংলার গ্রামে গ্রামে সংরক্ষিত ও অনুসৃত অকৃত্রিম, অমিশ্র এই সব সহজ ও বলিষ্ঠ ভাবধারা ও ছন্দধারা থেকে।* এগুলি ভারতের স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারার সত্য রূপের প্রতীক ; এবং এগুলির বাহক বাংলার ব্রতচারী-প্রচেষ্টা। এই দিক থেকে দেখতে গেলে, আমরা বুঝতে পারব যে বাংলার ব্রতচারী-প্রচেষ্টার দ্বারা বাংলার সংস্কৃতি সমগ্র ভারতে প্রচারিত হবার সূচনা হয়েছে, এবং হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য এই প্রচেষ্টায় সগর্ব্বে ও সানন্দে যোগ দিয়ে একে জয়যুক্ত করা।

---

* মহীশূর ও মাদ্রাজ প্রদেশেও ব্রতচারীর প্রচেষ্টার সর্ব্বভারতীয় প্রকৃতি স্বীকৃত হয়েছে এবং মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ ভারত ব্রতচারী সমিতি বাংলার ব্রতচারী প্রচেষ্টাকে দক্ষিণ ভারতে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছেন ও বাংলার ব্রতচারী শিবিরে শিক্ষার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন।

গণস্বরাজ ও গণসাম্যের আদর্শ

ডেমক্রেসী কথাটা আজকাল খুবই শোনা যায়, যাকে বাংলায় আমরা গণসাম্য বলে অভিহিত করতে পারি। ইংরাজেরা ত বলেনই, এমন কি আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে অনেকে বলে থাকেন যে এই ডেমক্রেসী বা গণসাম্যের আদর্শ প্রাচীন ভারতে ছিল না, এটা ভারতে প্রতীচ্যের অবদান। হয়ত তাই। তবে প্রতীচ্যের আদর্শের এই ডেমক্রেসীতে বাস্তবিক কতটা গণসাম্য আছে, তা ভেবে দেখা দরকার। এই সংশ্রবে জাতিভেদের কথাও বিশেষ করে ওঠে। কারণ আমাদের শাসকগণ ও ইউরোপীয় ডেমোক্রেসীর আদর্শে যাঁরা মুগ্ধ তাঁরা বলেন যে জাতিভেদ ডেমোক্রেসীর অর্থাৎ গণসাম্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইউরোপীয় ডেমোক্রেসীর সঙ্গে জাতিভেদের পরিপন্থিতা সত্য হতে পারে কিন্তু তাই বলে প্রকৃত গণসাম্যের সঙ্গে জাতিভেদের মূলতঃ পরিপন্থিতা আছে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ।

এখনকার যে সম্পর্ক সে হচ্ছে কেবলমাত্র বাহ্যিক, তখনকার সম্পর্ক ছিল মুখ্যতঃ আন্তরিক। সমস্ত গ্রামের লোক ছিল যেন একটা পরিবারের অন্তর্গত। এই এক-পরিবার-ভাব—এই অন্তরগত ঐক্যের ভাব নানা রকমে প্রকাশ পেত।

প্রথমত—পরস্পর সম্পর্ক স্থাপনের দিক দিয়ে। গ্রামের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে একটা কিছু সম্পর্ক পাতিয়ে নিত—তা হোক তারা হিন্দু, হোক তারা মুসলমান; হোক তারা ব্রাহ্মণ, হোক তারা চণ্ডাল। একে অন্যের হাতে খাওয়ার চল থাক না থাক, একে অন্যের হয় খুড়ো, কি খুড়ী; জ্যাঠা কি জ্যোঠী; চাচা কি চাচী; মামা কি মামী; দাদা কি দিদি—ইত্যাদি একটা না একটা কিছু

সম্পর্ক পাতান থাকত। এতে করে যে একটা পরস্পর আত্মীয়তার ভাব আসত, তা আজকাল তুর্ল্ভ।

দ্বিতীয়ত—এই পরস্পর পারিবারিক ভাব প্রকাশ পেত পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের সালিসী মীমাংসার প্রথায়। গ্রামের বিবাদ গ্রামেই সালিসী করে মিটিয়ে নেবার প্রথা তখন প্রচলিত ছিল। আজকাল দেখা যায় গ্রামে সামান্য ব্যাপার নিয়ে একটু কিছু ঝগড়া-কলহ হলেই সেটি নিয়ে যাওয়া হয় শহরের কোন আদালতে; অন্ততঃ সবচেয়ে সন্নিকটস্থ ইউনিয়ন আদালতে। তখন গ্রামের ঝগড়া বাইরে নেওয়াটা নিতান্ত অন্যায় বলে বিবেচিত হত। গ্রামের মোড়লদের কাছেই গ্রামের সব রকমের ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা হত।

তৃতীয়ত—আভিজাত্যের দেমাকের সম্পূর্ণ অভাবে এবং সমাজে উচ্চস্থানকে এবং জমিদারের পদকে পরের উপর দাবীর অধিকার স্বরূপ বিবেচনা না করে পরের প্রতি কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বিবেচনাতে। যারা ধনী, যারা পদস্থ, যারা জমিদার তাদের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল গ্রামের অন্যান্য লোকের অমায়িক ভাবে আতিথেয়তার ও আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করা। পরব, পূজা, পার্ব্বণের ভিতর দিয়ে ও মুক্ত-হস্তে অতিথি-সেবা প্রথার ভিতর দিয়ে এই কর্ত্তব্য সম্পাদিত হত।

চতুর্থত—শ্রমের সার্ব্বজনীন মর্য্যাদায়। কি জমিদার, কি প্রজা গায়ে-খাটা সকলেরই কর্ত্তব্য বলে বিবেচিত হত। আমাদের খাসে যে জমি ছিল, আমার জ্যাঠামহাশয় প্রজাদের সঙ্গে সেই জমিতে নিজের হাতে লাঙ্গল চালাতেন। আমিও তাঁর সঙ্গে তখন খোলা মাঠের ধানের ক্ষেতে নিজ হাতে লাঙ্গল চালিয়ে শৈশবেই এক গভীর গণসাম্যের আস্বাদ লাভ করেছিলাম। আমার বাবা ছিলেন বাগান-প্রেমিক। তিনি নিজ হাতে ফল-ফুলের বাগান করতেন; ফল-ফুলের গাছ লাগাতে ভালবাসতেন। খুরপি, কোদাল হাতে তিনি প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা এই কাজে সানন্দে ব্যাপৃত থাকতেন।

এই তো গেল পুরুষদের কথা। কিন্তু এই শ্রমের মর্য্যাদার ধর্ম্ম

কেবল পুরুষদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। আমার মা নিজ হাতে কোদাল নিয়ে সবজী-বাগান প্রস্তুত করতেন। তিনিই প্রথম আমাকে কোদাল চালাতে শেখান। তিনি প্রকৃতই তাঁর পিতার দুহিতা হবার শিক্ষা পেয়েছিলেন; তিনি নিজ হাতে আমাদের বাড়ীর গায়ের দুধ দুইতেন।

পঞ্চমত—খেলার ক্ষেত্রে। খেলাতেও তখন আজকার মত জাতিভেদের সৃষ্টি হয় নি। তখন খেলার ক্ষেত্রে বাস্তবিকই গণসাম্য ছিল। আমি গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খোলা মাঠে গরু চরাতাম, আর হা-ডু-ডু, গুলি-ডাণ্ডা ইত্যাদি খেলা তাদের সঙ্গে খেলতাম। ক্রিকেট, টেনিস, হকির আভিজাত্য ও বর্ণভেদ তখন আমাদের গ্রামে প্রবর্ত্তিত হয়নি।

ষষ্ঠত—সাম্প্রদায়িকতার সম্পূর্ণ অভাবে। হিন্দুতে মুসলমানে তখন গভীর ঐক্য ছিল। পরস্পর ভাই, চাচা, মামু ইত্যাদি সম্বোধনের ভিতর দিয়ে ঐক্য ত ছিলই, এ ছাড়া সামাজিক উৎসব পার্ব্বণে হিন্দুরা মুসলমানদের বাড়ীতে আতিথেয়তা এবং মুসমানরা হিন্দুদের বাড়ীতে আতিথেয়তা সানন্দে গ্রহণ করতেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বাড়ীতে পান-সুপারী গ্রহণ করতেন। হিন্দুরা মুসলমান-দের বাড়ীতে এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বাড়ীতে জলযোগ ও অন্যান্য কিছু আহার না করলেও সেটা অহঙ্কার বলে গণ্য না হয়ে সামাজিক সংস্কারমাত্র বলে গণ্য হত, এবং তাতে পরস্পর সৌহার্দ্দ্যের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হত না।

সর্ব্বশেষে সবচেয়ে গভীর গণ-সাম্যের অন্তরগত সাম্যভাবের প্রকাশ হত আত্মার নির্মল আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করে আমাদের বাড়ীর প্রশস্ত খোলা উঠানে আমাদের গ্রামের প্রায় প্রত্যেক হিন্দু-পরিবারের পুরুষগণ এসে সমবেত হতেন এবং সেখানে কয়েক ঘণ্টাকাল কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। আজকাল শহরে যেমন বৈঠকে ব'সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কীর্ত্তন

হয়, তখন সে রকম কীর্তনের প্রথা অজ্ঞাত ছিল; তখনকার কীর্ত্তন-গান হত উঠানে ঘুরে ঘুরে, সহজ সরল কীর্ত্তন-নৃত্যের সহিত, এবং খোল ও মৃদঙ্গের সঙ্গতে। আমার বাবা কীর্ত্তনের পরম অনুরাগী ছিলেন। আমাদের গ্রামের সকল লোক ও আমাদের নমশূদ্র, যুগী ইত্যাদি প্রজাগণ মিলে যখন মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে কীর্ত্তনে ব্যাপৃত হতেন, তখন আমার বাবা ও অন্যান্য বিত্তশালী ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র একখানা ধুতি পরে, খালি গায়ে সেই মণ্ডলীর মধ্যস্থলে উঠানের মাটিতে সাষ্টাঙ্গভাবে শুয়ে গড়াগড়ি দিতেন এবং আমাদের নমঃশূদ্র, যুগী ইত্যাদি জাতির প্রজাগণের ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের পদধূলি গায়ে মেখে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। এই গ্রামের মাটির ধূলিকণার সংযোগ—গ্রামের আপামর-সাধারণের পদধূলির সংযোগকেই তিনি ও গ্রামের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ভূমার সংযোগ বলে মনে করে কৃতার্থ হতেন।

এই কীর্ত্তনের প্রথার মধ্য দিয়ে যে গণ-সাম্যের ভাব দেখেছি, তা ছিল আত্মায় আত্মায় সাম্যের ভাব। এক তালে শত শত লোকের হাত পা উঠছে পড়ছে; এক সুরে শত শত কণ্ঠের তান সংযুক্ত হচ্ছে; এক ভাবেতে উদ্দীপিত হয়ে শরীর-মন ছন্দে ছন্দে সমন্বিত ও অভিসংযুক্ত হচ্ছে। আর যে ভাবে মিলিত হচ্ছে সে কেবল একটা বাইরের স্বার্থের বা বাইরের সংযোগের ভাব নয়—অন্য কোন দেশের প্রতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষমূলক সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব নয়—ব্যক্তির ক্ষুদ্রতার সীমা অতিক্রম করে ও বিনষ্ট করে বহুর সঙ্গে কায়মনোবাক্যের ছন্দ-সংযোগে—একদিকে আত্মায় আত্মায় সংযোগ স্থাপিত হয়ে বহুকে বাস্তব পক্ষে এক করে তোলার অব্যর্থ প্রণালী—অপর দিকে মানবাত্মাকে ভূমির সঙ্গে সংযোগলাভ করিয়ে দিয়ে তার মনের সকল মিথ্যা গর্ব্ব ও কৃত্রিমতা নাশ করার প্রণালী।

আমার বাবা যখন ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়ে তাঁর নমঃশূদ্র যুগী

ইত্যাদি জাতীয় প্রজাদের পায়ের ধূলি সানন্দে ও সাগ্রহে গ্রহণ করে আপনাকে কৃত-কৃতার্থ মনে করতেন, তখন তিনি যে তাদের হাতে খেতেন না বা তাদের সঙ্গে যে আমাদের সামাজিক নিয়মে বিবাহ ইত্যাদির প্রথা চল ছিল না, এগুলি নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য বাহ্যিক ব্যাপার বলে মনে হত।

আত্মায় আত্মায় যেখানে জাতিবর্ণনির্বিশেষে পরস্পর গভীর শ্রদ্ধা ও সাম্যের এমন পরাকাষ্ঠার বিকাশ, সেখানে এমন একটা গভীর অন্তরগত ঐক্যের সৃষ্টি হয়, যার তুলনায় বাইরের সামাজিক ছোট-খাট বিভেদগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিতকর হয়ে পড়ে।

মোট কথা, আত্মায় আত্মায় গভীর অন্তরতম প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সাম্য ও ঐক্যে যে জনসমাজে ছোটবড় নির্ব্বিশেষে ও পদমর্য্যাদা-নির্ব্বিশেষে স্থাপিত হতে পেরেছে, সেখানে বাহ্যিক সাম্য-স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

কেবল কীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে নয়, শত শত পর্ব্ব ও উৎসবের মধ্য দিয়ে এই আত্মায় আত্মায় পরস্পর শ্রদ্ধা সাম্য ও ঐক্যের আয়োজন প্রতি গ্রামের ও একাধিক গ্রামের লোকের মধ্যে হত। মেয়েদের মধ্যেও ব্রত, পূজা, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে ঠিক এই প্রকার নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে ও পবিত্র সামাজিক ও আত্মিক আদর্শের অনু-প্রেরণার মধ্য দিয়ে সহজ সরল ও উদার ভাবে পরস্পর শ্রদ্ধা, সাম্য ও ঐক্যের সৃষ্টি হত।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একদিকে তো নমাজ প্রথার মধ্য দিয়ে ছোটবড়নির্ব্বিশেষে ও পদমর্য্যাদানির্ব্বিশেষে সম্পূর্ণ সাম্য ও ঐক্যময় ভিত্তির উপর মিলনের ব্যবস্থা ছিলই—যা এখনও সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে—তা ছাড়া মহরম ইত্যাদি উপলক্ষে জারি-গানের ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে শত শত লোকের মধ্যে কায়মনো-বাক্যের ছন্দোবদ্ধ মিলনের বহু ব্যপক ব্যবস্থা ছিল এবং এই মিলনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পর্য্যন্ত বিভেদ দূর হয়ে এক বিশাল

ঐক্য সংস্থাপিত হত; কারণ হিন্দুগণও মহরম ইত্যাদিতে সানন্দে ও সাগ্রহে যোগ দিতেন।

এখনকার যুগে আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই অন্তরগত ঐক্যের ও সাম্যের সংযোগ হারিয়েছি। এখন আমাদের আদর্শ হয়েছে একটা বাহ্যিক ডেমক্রেসী, একটা বাহ্যিক সাম্য, বাহ্যিক ঐক্য। কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, কি অর্থনীতির ক্ষেত্রে, এই বিশাল পার্থক্য লক্ষিত হয়। এখন আমরা আইনের সাহায্যে, বাইরের শত সহস্র গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে গণসাম্য ও গণ-ঐক্য আনবার যতই চেষ্টা করছি, আমাদের আত্মায় আত্মার শ্রদ্ধা ও ঐক্য ততই দূরে অপসারিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

আগেকার খাওয়া-দাওয়া প্রথা ও বিবাহ প্রথার মধ্য দিয়েই কেবল একটা বাহ্যিক জাতিভেদ ছিল; কিন্তু জাতির সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি সবচেয়ে গরীব ও নিম্নজাতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আত্মার সমতা অনুভব করতেন ও তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে অপমান বা কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তখন ছিল আত্মায় আত্মায় জাতিভেদের সম্পূর্ণ অভাব।

এখন খাওয়া-দাওয়া ও বিবাহ ইত্যাদিতে হয়ত জাতিভেদ অনেকটা চলে যাচ্ছে; কিন্তু বাহ্যিক আচারগত ও আইনগত দাবীর সাম্যকে ছাপিয়ে অন্যান্য যে সকল নূতন জাতিভেদের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেগুলি অতি বিষময় ও সেগুলি আন্তরিক সাম্য ও ঐক্যের সম্পূর্ণ বিধ্বংসী। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে খেলাধূলার ভিতর দিয়ে যে নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে, তার কথা বলা যেতে পারে। আজকাল যাঁরা পোলো খেলতে পারেন বা খেলেন তাঁরা হচ্ছেন একটি চূড়ান্ত আভিজাত্যের অধিকারী। যাঁরা ক্রিকেট খেলেন, তাঁরা পোলো খেলোয়াড়ের চেয়ে একটু নীচে; কিন্তু টেনিস খেলোয়াড়দের থেকে নূতন আভিজাত্যে উচ্চ-শ্রেণীর।

আবার টেনিস খেলোয়াড়রা হকি খেলোয়াড়দের চেয়ে উচ্চজাতীয়। হকি খেলোয়াড়রা আবার ফুটবল খেলোয়াড়দের চেয়ে উচ্চজাতীয়। আর যাদের ফুটবল কেনবার ও খেলবার অর্থসঙ্গতি নাই—অর্থাৎ যারা হা-ডু-ডু, কপাটি ইত্যাদি বা দাড়িয়া বাঁধা, গোল্লাছুট, ডাণ্ডা-গুলি প্রভৃতি খেলে—তারা তো নেহাৎ হরিজন-স্থানীয়। এক একজন টেনিস ও ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নের মুখে ও আচার-ব্যবহারে যারা টেনিস খেলায় অপারগ বা অপারদর্শী তাদের প্রতি যে গভীর ঘৃণা ও অনুকম্পার ভাব দেখতে পাই, অথবা যারা নিতান্ত দেশী খেলা খেলে, ফুটবল খেলোয়াড়দের তাদের প্রতি যে গভীর অবজ্ঞার ভাব দেখতে পাই, তার তুলনায় পুরানো জাতিভেদ প্রথার বিভেদভাব অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিতকর।

তা ছাড়া আগেকার আনন্দ ও খেলার প্রথাগুলি ছিল পরস্পর সাম্য-সংগঠনের সোপান ও সহায়ক। এখনকার খেলাগুলি এত ভীষণ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় যে এগুলির ভিতর দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ক্লাবে ক্লাবে, সমিতিতে সমিতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, হিন্দুতে মুসলমানে যে ভীষণ অনৈক্যের গরলের সৃষ্টি হচ্ছে—আমাদের দেশের জীবনে প্রাচীন যুগে তার একান্ত অভাব ছিল।

সুতরাং এখনকার দিনে বাস্তবিক গণসাম্যটা নিতান্ত একটা বাহ্যিক ও আইনগত ব্যাপার; একটা বাইরের খোলসমাত্র। আন্তরিক গণসাম্যের জায়গায় এখন আমরা পাচ্ছি গণ-প্রতিযোগিতা ও গণপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, গণহিংসা, ও আত্মায় আত্মায় জাতিভেদ আনন্দের ক্ষেত্রে জাতিভেদ, ক্রীড়ার ক্ষেত্রে জাতিভেদ। এখন আর ধনীতে দরিদ্রে একজোটে খেলার, গানের ও নির্ম্মল নৃত্যের প্রথা নাই। আছে খালি ধনীতে ধনীতে ও বুর্জ্জোয়াতে বুর্জ্জোয়াতে অর্থাৎ মধ্যবিত্তে মধ্যবিত্তে—শিল্ডপ্রতিযোগিতা ও পাশ্চাত্য বাহ্যিক গণসাম্যের দাসত্ব মূলক অনুকরণ। আছে এখন

জাতির প্রাচীন প্রথাগত আনন্দের, ক্রীড়ার ও নৃত্যগীতের প্রণালীর প্রতি গভীর ঘৃণা ও অবজ্ঞা এবং তার ফলে আত্মায় আত্মায় গভীর মিলনের প্রণালীর একান্ত অভাব।

আমরা আজকাল যে mass contact (গণ-অভিসংযোগ)-এর কথা বলি—সেটাও পাশ্চাত্য ধরণের অনুকরণমূলক একটি সম্পূর্ণ বাহ্যিক ব্যাপার।

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে, পদমর্য্যাদা-নির্ব্বিশেষে যতদিন আমরা খাঁটি ভারতীয় প্রণালীতে গণসাম্যের ও আন্তরিক গণ-অভিসংযোগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে না পারব, ততদিন ভারতের প্রকৃত গণসাম্য ও গণস্বরাজের ব্যবস্থা অসম্ভব হবে।

জাতির ব্যক্তিবর্গের অন্তরে অন্তরে যদি সাম্য ও ঐক্যের যোগ সূত্র স্থাপন করতে হয়, তবে তার একমাত্র উপায় জাতির নিজস্ব সংস্কৃতিধারার ভিতর দিয়ে আত্মায় আত্মায় সংযোগ-স্থাপনের। কিন্তু যতদিন আমরা পাশ্চাত্য সাম্যবাদের বাহ্যিক ঝলকে ভুলে এবং পাশ্চাত্য খেলাধূলা-প্রণালীর গৌরবে মোহিত হয়ে আমাদের নিজের দেশের আন্তরিক গণসাম্য-স্থাপনের প্রথাকে অবজ্ঞা করব, আমাদের নিজের দেশের চির-প্রচলিত খেলা-ধূলা ও নৃত্যগীতের আনন্দময় ধারাগুলিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখে সেগুলির পুনঃপ্রবর্ত্তন করে তাদের ভিতর দিয়ে দেশের ধনী-দরিদ্র ও আবালবৃদ্ধের মধ্যে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ও পদমর্য্যাদানির্ব্বিশেষে গভীর অন্তরগত গণসংযোগ ও গণসাম্যের ভিত্তি স্থাপন করতে না পারব, ততদিন প্রকৃত গণস্বরাজ-প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত হবে।

ব্রতচারী চায় পুনঃপ্রবর্ত্তন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সেই স্ব-জাতীয় সংস্কৃতি-সম্ভূত আন্তরিক, অন্তরগত ও সার্ব্বজনীন গণসাম্যের—যার ভিতর দিয়ে ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জ এক গভীর অন্তরগত ঐক্যে যুক্ত হয়ে দেশে প্রকৃত গণস্বরাজের প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

ব্রতচারী আভাষণ

১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাসে আমি বীরভূম জেলায় রায়বেঁশে নৃত্যের পুনরাবিষ্কার করি, রায়বেঁশেগণ নৃত্য করতে করতে মুহুর্মুহু 'ই-আঃ' চীৎকারের সঙ্গে ডান হাত সজোরে উর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত করে। আবার নৃত্যের শেষে তিন বার ডান হাত দিয়ে মুখে তালি দিয়ে 'আবা, 'আবা' শব্দ করে, তার পর ই-আঃ চীৎকার করে ডানহাত উর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত করে। আমি আমাদের বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব বীরোচিত আরাব প্রণালীতে বিশেষ করে যে একটা প্রাণের সমুন্নতি হয় তা লক্ষ্য করে ইহার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হই এবং তৎক্ষণাৎ এই আরাবকে তরুণ ভারতের নবজীবন অভিযান আরাব স্বরূপ গ্রহণ করি এবং ব্রতচারী সংচেষ্টার ভিতর ইহাকে সন্নিবিষ্ট করি।

মুখে ডান হাত দিয়ে তালির সঙ্গে সঙ্গে সজোরে 'আবা' 'আবা' আরাব আমার কাছে নতূন লাগেনি। কারণ পূর্ব্ব বাংলার নৌকা বাচ খেলাতে বিজয়াদল বরাবরই ঐরূপ বিজয়ী আরাব যে দেয়, তা আমি জানতাম। পরে দেখা গেল যে 'আবা' 'আবা' দিয়া খেলা বাংলার একটি প্রাচীন জাতীয় প্রথা। কারণ পদকল্পতরুতে পাওয়া গেল—

"আবা আবা আবা দিয়া নাচিতে লাগিল।"

ডান হাতটা উর্দ্ধে তোলবার যে রায়বেঁশে আরাবের প্রথা, ইহার যে কোন সাহিত্যগত প্রাচীন সমর্থন আছে, তা আমার তখন জানা ছিল না। বছরখানেক পরে আমি যখন ব্রতচারী প্রথা দার্জিলিং জেলায় প্রবর্ত্তন করি, তখন সেখানকার ফরেষ্ট অফিসের উর্দ্ধতন কর্মচারী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রকুমার বসু ব্রতচারী ভুক্তি গ্রহণ করার সময় আমাকে বললেন যে, ডান হাত তুলে ব্রতচারী আভাষণের ঠিক অনুরূপ প্রণালীর উল্লেখ সংস্কৃত মহাভারতে আছে

এবং আমার অনুরোধে তিনি আমাকে মহাভারত থেকে তা বের করে দিলেন। শান্তি পর্ব্বের ৫৩ অধ্যায় ২৪ ও ২৫ পদে।

ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত, তখন বহু ঋষিগণ তাঁহাকে চারিদিক বেষ্টন করে বসেছেন ; এইসময় পঞ্চপাণ্ডবগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতে যান, তাঁরা রথে চড়ে গেলেন ; আর তাঁদের সঙ্গে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি। এরা সকলে সেখানে পৌঁছে ভীষ্ম ও ঋষিদিগকে অভ্যর্থনা করলেন—ডান হাত উর্দ্ধে উত্থিত করে। ইহারই বর্ণনা আছে উপরোক্ত দুটি পদে। এই দুটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম :—

তত যযৌ যত্র ভীষ্মঃ শর-তল্প-গত-প্রভু
রাস্তে সার্দ্ধং মহর্ষিভিব্রহ্মা দেবগণৈর্যথা।
ততোঽবতীর্য্য গোবিন্দোরথাৎ স চ যুধিষ্ঠিরঃ
ভীম গাণ্ডীবধন্বা চ যযৌ সাত্যকিরেবচ
ঋষিনভ্যর্চ্চয়ামাসুঃ করানুদ্যম্য দক্ষিণান্।

ইহার অনুবাদ :—

"তখন তারা গেলেন সেই স্থানে—যেখানে দেবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্রহ্মার ন্যায় মহর্ষিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভু ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। তার পর গোবিন্দ (কৃষ্ণ), যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এবং সাত্যকি রথ হইতে অবতরণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া ঋষিদিগকে অভ্যর্চ্চনা করলেন।"

এখানে বুঝতে হবে যে এই যে ডান হাত উত্তোলন করে অভ্যর্চ্চনা করলেন, এটা করলেন ব্রাহ্মণেরা নয়, করলেন ক্ষত্রিয়রা অর্থাৎ এটা আশীর্ব্বাদ সূচক অঙ্গভঙ্গী নয়। এটা ছিল প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়োচিত অভিবাদন প্রণালী। বীরের অভিবাদন প্রণালী রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধরগণ যে প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের বীরোচিত অভিবাদন প্রণালীই যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করে আসছে,

তা এই মহাভরেতের ক্ষত্রিয়দের অভিবাদনের সঙ্গে তাদের আরাব প্রণালীর অপ্রত্যাশিত মিল থেকেই প্রমাণিত হল।

এর পরে আর কেহ যদি বলেন যে, ব্রতচারী অভিবাদন প্রণালীর হাত উত্তোলন করার ভঙ্গীটি ফ্যাসিষ্ট বা নাৎসীদের অনুকরণে কল্পিত, তবে তারা আপন দেশের প্রাচীন হতিহাস সাহিত্য ও ঐতিহ্যের সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচয় দিবেন।

আজকাল জাতিগঠনের আহ্বান আমাদের দেশে সব ক্ষেত্রে এসেছে। কিন্তু জাতি গঠনের মূলীভূত প্রণালী সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেরই ধারণা আছে। জাতি গঠনের একটি সবচেয়ে মূলীভূত প্রণালী আপন দেশের প্রাচীন প্রথার মধ্যে যেগুলি নির্দোষ ও বলদায়ী, সেগুলি সযত্নে পরিপোষন ও প্ররক্ষণ করা এবং জীবনে চালু রাখা। ।র একটি মূলীভূত প্রণালী—দেশের সকল সম্প্রদায় যে প্রথাগুলি বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করে সেগুলির প্রবর্ত্তন করে সকলের মধ্যে ঐক্য ও অভিন্নভাব স্থাপন করা। আমাদের দেশের অভিবাদন প্রণালীতে সাম্য নাই। হিন্দুরা করেন হাত জোড় করে, মাথা নুইয়ে নমস্কার। মুসলমানেরা হাত জোড় করতেও আপত্তি করেন, মাথা নোয়াতেও আপত্তি করেন, তাদের প্রণালী হচ্ছে ডান হাত মাথায় ছুঁইয়ে "আদাব"। হিন্দু মুসলমান সকলকে মিলিয়ে এক শক্তি গড়তে হলে যেমন এক ভাষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন তেমনিই এক অভিবাদন প্রথারও প্রয়োজন। অবশ্য হিন্দু সামাজিক ভাবে হিন্দুর নমস্কারই করবেন, আর মুসলমান সামজিক ভাবে আদাবই করবেন। কিন্তু জাতিগত ভাবে যখন উৎসব হবে তখন সকলেই ব্রতচারী আরাব করে অভিন্নতা আনয়ন করতে সক্ষম হবেন। এতে ভারতের প্রাচীন বীরোচিত অভিবাদন প্রণালীরও পরিপোষণ ও প্ররক্ষণ হবে। এতে কারও ধর্মের ব্যাঘাত হবে না।

বস্তুতঃ ডান হাত উত্তোলন করে "তামান্নি নামক অভিবাদন প্রথা যে প্রাচীন কালে অর্থাৎ খলিফাদের সময়ে বোগদাদ রাজ্যে প্রচলিত

ছিল, তা ব্রতচারী সামসুন উলেমা কামাল উদ্দিন আহমদ-জী আমাদের জানিয়েছেন, সুতরাং ব্রতচারী প্রথায় ডান হাত তুলে অভিবাদনে হিন্দুমুসলমান উভয়ের গৌরব অনুভব করা উচিত।

ব্রতচারী আভাষণে ডান হাত তোলা হয় সোজা উপরের দিকে, শরীর ও মাথার সঙ্গে সমন্তরালভাবে; নাৎসী ও ফ্যাসিষ্টদের মত সামনের দিকে হাতটি হেলিয়া দেওয়া হয় না। পাঁচটি আঙ্গুল এক সঙ্গে দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন থাকে। তাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে পাঁচটি আঙ্গুল ক্রমভাবে জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ ব্রতচারীর এই পঞ্চব্রত সূচীত করে এবং পাঁচটি আঙ্গুল এক সঙ্গে দৃঢ় ভাবে যুক্ত থাকায় পঞ্চব্রতের যুগপৎ অনুষ্ঠান সূচিত হয়। হাতটি সোজা উপরে উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের উচ্চতম আদর্শ ও আকাংক্ষা সূচিত হয়।

রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধরগণ এই আভাষণের সঙ্গে ই-আঃ আরাবটি ব্যবহার করেন। ইহার কি সাংঘাতিক অর্থ, তাহা তাহাদের স্মরণ নাই, তাই আমি অনেক চিন্তার পর ইহার একটি যোগ্য অর্থ নির্দ্ধারণ করেছি—ইষ্ট কথাটির প্রথম অক্ষরে "ই" এবং আভাষণ কথাটির প্রথম অক্ষর "আ"। সুতরাং "ই-আ" এই সঙ্কেত দ্বারা ইষ্ট আভাষণ সূচনা অস্বাভাবিক নয়। তাই ব্রতচারী আভাষণে 'ই-আঃ' কথার অর্থ ইষ্ট-আভাষণ; অর্থাৎ মঙ্গল ইচ্ছা। ১৯৩০ সন থেকে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত 'ই-আঃ' এই আরাবের সঙ্গে ডান হাত উত্তোলনেই ব্রতচারী অভিবাদনের সমাপ্তি হইত। কিন্তু ইহাতে একটি অসম্পূর্ণতা ছিল। ব্রতচারী পরিকল্পনায় আছে দুটি উপাদান। একটি আত্মার আদর্শ, অপরটি স্বভূমিধারা। ই-আঃ আরাব ও হস্ত উত্তোলন আত্মার আদর্শই সূচনা করে। স্বভূমির ধারার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় না। তার কেবল আমাদের নিজের স্বভূমির কথা নয়, অন্যান্য দেশবাসীর স্বভূমির ধারার যে একটি পবিত্র যোগ্যতা রয়েছে তাও স্মরণ করিয়ে দেয় না। তাই ১৯৩৬ সনের

ডিসেম্বর মাসে দমদম উপশীলন শিবিরে ঠিক হল যে এখন থেকে ব্রতচারী ইষ্ট আভাষণের শেষ অংশে থাকবে স্বভূমির, যা অপরের ভূমির অথবা বিশ্বভূমির ধারার সংকেত। বাঙ্গালী তাই হিসাবে, ইষ্ট আভাষণে বলবে—"ই-আঃ জ-সো-বা" (জয় সোনার বাংলার)। আবার বাঙালী ও অন্যান্য প্রদেশের ভারতীয়গণ ভারতীয় হিসাবে বলবে—"ই-আঃ জ-সো-ভা" (জয় সোনার ভারতের অথবা হিন্দুস্থানীতে-জয় সোনারা ভারতকী)। আবার বিশ্বভুবনের অধিবাসী হিসাবে সকলেই আমরা বলব—"ই-আঃ-জ-সো-ভু" (জয় সোনার ভুবনের)। আবার অন্যকোন দেশের অধিবাসীকে অভ্যর্থনা করতে গেলে সেই ভূমির নামের প্রথম অক্ষরকে বসানো হবে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ পাঞ্জাবের অধিবাসীকে অভিবাদন করতে বাংলার ব্রতচারী বলবে—"ই-আঃ জ-সো-পা"। ইটালির অধিবাসীকে অভিবাদন করতে বলবে "ই-আঃ জ-সো-ই"। এইভাবে ব্রতচারী তার অভিবাদন ও আভাষণ প্রণালীর মধ্যে আত্মার আদর্শ ও ভূমিপ্রেমের সমন্বয় করতে সমর্থ হয়। ব্রতচারী আভাষণের যে এতটা গভীর অর্থ আছে তা ব্রতচারীদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। অব্রতচারীদের তো কথাই নাই।

আমাদের উচিত ব্রতচারী আভাষণের এই প্রকৃত ও পূর্ণ ও গভীর অর্থ প্রত্যেকে অভিবাদনের সময় সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া।

"ই-আঃ-জ-সো বা! জ-সো-ভা! জ-সো-ভু!"

———

সখ্য-সাম্য সং-স্থাপন

মানুষে মানুষে অচ্ছেদ্য প্রীতির সম্পর্ক হোক, ঘৃণা বিদ্বেষ দূর হয়ে যাক,—ব্রতচারীর এই সাধনা। একজন অন্যকে ছোট মনে করবে, তাকে পদানত করে রাখতে চাইবে—যে মনোবৃত্তির ফলে এসব সম্ভব হয়, ব্রতচারী তার মূলোচ্ছেদ করবে। শক্তি ও প্রতিষ্ঠা মানুষকে করে দম্ভী, অতি গর্বিত; আবার শক্তি ও সমৃদ্ধিহীনতার জন্য মানুষ হয়ে পড়ে কুণ্ঠিত, অতি বিনয়ী। ব্রতচারীর অভিযান এ উভয়েরই বিরুদ্ধে। ব্রতচারীর আদর্শে ভবিষ্য বাংলার যে সহস্র সহস্র বীর্যবান সন্তান তৈরী হচ্ছে, তারা অবিনয়ী নয়—কিন্তু মাথা ও মেরুদণ্ড খাড়া করে চলে।

বড় বড় ব্রতচারী জমায়েতে গিয়েছি। তার মধ্যে রাজা মহারাজা আছেন, রাজনৈতিক নেতারা আছেন, শিল্পী আছেন, কলেজ স্কুলের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা আছেন—আবার দারোয়ান, গাড়োয়ান, মেথর, মুদ্দরাম—সকল শ্রেণীর সংখ্যাতীত মানুষের জনতা জমেছে। আরাব উঠল 'ই-আ'! সকলেই আকাশের দিকে কর প্রসারণ করেছেন; পা থেকে মাথা এবং উর্দ্ধোত্থিত করের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ঋজু একটি রেখা—কোথাও তার এক তিল নমিত নয়। নাৎসী বা ফ্যাসিষ্ঠদের মতো বাহু ঈষন্নিম্ন বা ভূমির সমান্তরাল হলে ব্রতচারীর চলে না। ব্রতচারী তার দেহ রূপ রেখাটি দিয়ে যেন ভূমির সঙ্গে ভূমার সংযোগ নির্দেশ করে। তখন মনে জেগে উঠে এই ভাব—একই আকাশ ও একই ভূমির অন্তর্বর্ত্তী আমরা মানুষদল, জীবনের পঞ্চব্রতের প্রতীক আমাদের পঞ্চাঙ্গুলি উর্দ্ধমার্গে প্রসারিত, আমরা সকলে সমান—ঐক্য ও প্রেমবদ্ধ। প্রভূত বিত্তশালী ও মহাপদস্থ ব্রতচারী ও তাঁর নিম্নতম পরিচারককে 'ই-আ' বলে ইষ্ট আভাষণ করবেন; এবং সেই পরিচারক ও 'ই-আ' বলে তাঁকে প্রতি আভাষণ জানাবেন। সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে 'ই-আ'

আভাষণের প্রবর্ত্তন করে ব্রতচারী যে সখ্য ও সাম্যবোধ জাগ্রত করেছে, তার পীঠভূমি অতি বিশাল ও ব্যাপক। এক আকাশ ও একই পৃথিবীর অধিকারী আমরা—সেই হিসাবে আমরা সকল মানুষ এক ও অভিন্ন।

দু'জন বাঙ্গালী ব্রতচারীর মধ্যে দেখা হলে 'ই-আ' ছাড়াও তাঁরা বলবেন—'জ-সো-বা' অর্থাৎ 'জয় সোনার বাংলা'। ব্যক্তির বিজয়ের কথা নেই—বলা হল, বিজয়ী হোক মোদের জন্মদেশ। ব্রতচারী মানুষের মর্মে মর্মে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করতে চায়, দেশের কাজ ব্রতচারীর জীবনব্রত। তাই বাক্যে ও ব্যবহারে মানুষকে অনুক্ষণ দেশের প্রতি সচেতন রাখার সর্বতোমুখী চেষ্টা ব্রতচারীর। 'জ-সো-বা' আভাষণের মধ্যে জাগছে যে সাম্য ও একাত্মবোধ তার পীঠভূমি জন্মদেশ। তুমি বাঙ্গালী, আমি ও বাঙ্গালী ; অতএব আমরা এক, —আমাদের লক্ষ্য এক,—আমাদের সাধনার পথও অভিন্ন।

ব্রতচারীর নামের শেষে "জী" যোগ করে অভিহিত করতে হয়। জাতি-ধর্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এইরূপ করার বিধি। যেমন ঃ তারকজী, আহ্‌মদজী, পোটারজী, অরুণাজী ইত্যাদি। 'জী' 'জীবনে'র রচনা করে। হিন্দিতে যেমন বাংলাতেও 'জী' সুপ্রচলিত ; যেমন—'বাবাজী'। আগে যাঁকে আমরা বলতাম তারকবাবু, ব্রতচর্যা গ্রহণ করে তাঁকে বলছি তারকজী! ব্রতচারী 'বাবু'র নির্বাসন ঘটাতে চায়, কারণ 'বাবু' কথাটা সাম্যের পরিপন্থী। "বাবু" বললে স্বতঃই এসে পড়বে আর এক সম্প্রদায়ের কথা যারা বাবু—পদবাচ্য নয়। বাবু যাঁরা তাঁরা দেহগত শ্রম করেন না, তাঁরা আলস্য ও বিলাসের অনুরাগী। এমন মানুষ দেশের মধ্যে থাকবে না ব্রতচারীর এই সাধনা। সবাই আমরা ব্রতচারীর দ্বিতীয় ব্রত 'শ্রমে'র অনুশীলন করব, সাম্য ও ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত হয়ে কর্মপ্রবণ আনন্দময় এক মহাজাতিতে পরিণত হব। তাই নামের শেষে জীব বাচক 'জী'র যোজনা দ্বারা আর এক দিক দিয়ে সাম্যের সূচনা করা হয়েছে। এই সাম্য ও সখ্যের পীঠভূমি জীবন। আমরা জীবন্ত, প্রাণবান—সেই হিসাবে সকলে আমরা এক।

ব্রতচারীর নৃত্য ও সমষ্টিগীতের মধ্যেও রয়েছে এই সখ্য সাম্যের সাধনা। গীত নৃত্যের মধ্যে অধিকারী ভেদ নেই—সক্ষম সুস্থ ব্যক্তি মাত্রেই এতে যোগ দিতে পারেন। এমন কি এ ব্রতচারীর অন্যতম কৃত্যের মধ্যে গণ্য। এর দ্বারা দেহ ও মন সুস্থ সবল হয়—জীবন-যাত্রার মধ্যে কোন রকম কুটিলতা ঘেঁসতে সাহস পায় না—সর্বোপরি জাগে সহ ব্রতচারীদের প্রতি সখ্য ও সাম্যবোধ। এটা একেবারে পরীক্ষিত সত্য। যে কেউ ব্রতচারীর কোন অভিপ্রদর্শন দেখেছেন—কোন কৃত্যালি সাধনা দেখেছেন, ঐক্য সাম্যের এই অমোঘ পন্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে কিছুমাত্র সংশয় নেই। শত শত ক্রোশ দূরে থেকে—জীবনে পরস্পরের মুখ না দেখেও ব্রতচারীরা ভাই ভাই। বড় বড় জমায়েতে দেখা গেছে, নানা অঞ্চলের বিভিন্ন সংঘ এসে অভিপ্রদর্শন করেছে, একসঙ্গে খাওয়া, বসা, হাসি, তামাসা, কাজকর্ম—যেন তারা একটি পরিবারের লোক, তাদের মধ্যে যেন চিরকালের চেনা জানা। এই বহুধা খণ্ডিত দেশের মধ্যে ব্রতচারী যেন মায়ামন্ত্রে সাম্য ও ঐক্যের জোয়ার নিয়ে আসছে। এরই জন্য ব্রতচারীর কৃত্যালি সাধনা এমন সফল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কয়েক বৎসর আগে কে কল্পনা করতে পেরেছেন, জেলার সবচেয়ে পদস্থ ব্যক্তি এবং সবচেয়ে নগণ্য ব্যক্তি গলাগলি হয়ে একসঙ্গে কাজে লাগতে পারবেন?

দেশের মানুষের মধ্যে আজ অজস্র রকমের দৌর্বল্য এসেছে। শারীরিক দৌর্বল্যের চেয়ে চিত্তের দৌর্বল্য আরও ভয়ানক ও মারাত্মক। দেশের কাজ করতে ইচ্ছুক ও উদ্যত হলেও অনেককে আমরা বিশ্বাস করি না, এক পাশে ঠেলে রাখি। কিন্তু ব্রতচারীর কাছে অন্ত্যজ কেউ নেই। যে ইচ্ছুক, দেশের কাজে তারই অধিকার—কোন বাধা নেই। ব্রতচারী পরিচেষ্টার মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র লুকোচুরি নেই—সমস্তই, উদার, অবাধ সূর্যের আলোর মতো সর্বত্র সমান প্রকাশিত।